	মলয় প্রাণ	||০	,,	গাঙ্গুলী এণ্ড কোং	২৲
	সুরথকুমার দাস	||০	,,	পলি ফটো ষ্টুডিও	||০

৭এ,	দেবেন সরকার	১৲	৭৯ ২এ, দেবীপদ ব্যানার্জি	১৲	
৭বি,	মন্মথনাথ ঘোষ	১৲	৭৯।২বি. কে, এল, চ্যাটার্জি	১৲	

৯৩,	মনার্ক সাইকেল
৯৪,	পপুলার হেয়ার
„	হিন্দ ব্যাঙ্ক লিঃ
„	কালীগঙ্গা ক্লথ
৯৫,	ফ্রেণ্ডস্ কেবিন
৯৬এ,	ডাঃ কে, গাঙ্গুলী

আবিষ্কারের কথা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[illegible] (আকর) গ্রন্থ

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৯৪৫

প্রকাশক—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

আট আনা
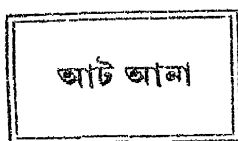
প্রিণ্টার — শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১,নন্দকুমার চৌধুরী লেন,কলিকাতা

উপহার

ভূমিকা

আজ আমরা সকলেই জানি যে, পৃথিবীর কোন্ দিকে কি দেশ আছে, সে দেশের কোথায় কি রহিয়াছে; কোথায় কোন্ মরুভূমি মাইলের পর মাইল পড়িয়া আছে, কোন্ পর্ব্বতের গুহা হইতে কোন্ নদী বাহির হইয়া কোথায় সাগরে গিয়া মিশিয়াছে!

ভূ-ভাগের সকল বিষয় আবিষ্কার শেষ করিয়া জ্ঞান-পিপাসু মানুষের মন আকাশের রহস্য ভেদ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অনন্ত আকাশে অজানা লক্ষ লক্ষ যে গ্রহ ঘুরিয়া ফিরিতেছে, তাহাদের জানিবার জন্য আজ মানব বিজ্ঞানের সকল শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। আজ তাহাদের সাধনা অসাধ্যসাধন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যখন এই পৃথিবীর অতি দুর্গম পথে তাহাদের অপূর্ব্ব দুঃসাহসিকতার সঙ্গে পরিচিত হই, তখন মনে হয়, এই কঠোর সাধনার নিকট একদিন হয়ত আকাশ, বাতাস, পৃথিবীর সমস্ত রহস্যই ধরা পড়িবে।

এখানে শুধু গল্প করিব, কেমন করিয়া দুঃসাহসী পর্য্যটক আর নাবিকরা জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া একদিনের অজানা পৃথিবীকে আজ সকলের জানা করিয়া তুলিয়াছে। কোনও বাধা তাহারা মানে নাই, কোনও বিপদকে গ্রাহ্য করে নাই, কোনও লোভ বা পুরস্কারের মোহ তাহাদের প্রেরণা দেয় নাই—ভয় কি তাহারা জানিত না। তাহাদের সেই দুঃসাহসিক সাধনার ফলেই আজ আমরা পরস্পর পরস্পরকে জানি ও চিনি এবং ভাবি যে একদিন এই পৃথিবীর সকল জাতি মিলিত হইয়া এক মহাশান্তির যুগ আনিবে—এক জাতি অপর জাতিকে পরমাত্মীয়ের মত দেখিতে শিখিবে।

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

আবিষ্কারের কথা

দক্ষিণ-মেরুর দেশে

"মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্ত কুমারী-ব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব্ব আভরণহীন ;
যেথা দীর্ঘ রাত্রি শেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন ! রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ থাকে নিদ্রা তন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্র জননীর মতো—"

বিশ্বকবির সঙ্গে তোমরা অনেকে হয়তো বলতে পারো যে, আমরাও মনে মনে দূর সিন্ধুপারে সেই মহামেরুদেশে ভ্রমণ করেছি—কল্পনায় কতবার অভিযানে বেরিয়েছি সেই দুর্গম অজানা পথে—সৃষ্টির সমবয়সী ধরণীর সেই রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করবার মানসে।

কিন্তু বহুলোক আমাদের অন্তরের এই কল্পনাকে প্রত্যক্ষ ভাবে সত্য করতে চেয়েছিল। উত্তর আর দক্ষিণ-মেরুর অনাবিষ্কৃত প্রদেশ আবিষ্কার করবার জন্য বহুলোক জীবন-মরণ তুচ্ছ করে অজানা সাগরের পথে পাড়ি দিয়েছে।

দক্ষিণ-মেরু-অনুসন্ধানকারী সেই দুঃসাহসী পর্য্যটকদের মধ্যে একজনের করুণ কাহিনী এখানে তোমাদের বলছি।

যখনকার কথা এখন বলতে চলেছি, তখন সেখানে, সেই বরফের দেশে, আটজন লোক দাঁড়িয়ে, তাদের কারুর মুখে কোনও কথা নেই। যেখানে কেউ কখনো আসতে পারে নি, এরা সেখানে এলো কি করে?

এদের আসার আগে আর একজন লোক দলবল নিয়ে এই দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কার করবার জন্যে বেরিয়েছিল। তাঁর নাম ক্যাপ্টেন স্কট। এই অনাবিষ্কৃত দেশের রহস্য ভেদ করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। বহুবার তিনি বহু ব্যর্থ চেষ্টা করেন; অবশেষে যে যাত্রায় তিনি সফল হলেন, সেবার আর ফিরে এলেন না। তাঁর দলেরও কেউ ফিরে এলো না। কোথায় গেল তারা, যে-দেশে কোনও মানুষের পায়ের দাগ পড়ে নি, তাদের পায়ের দাগ কি সেখানেই মিলিয়ে গেল?

স্কটকে খুঁজে বার করবার জন্যে সারা জগতে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমরা যে আটজনের কথা বলছিলাম, তারা স্কটকে খোঁজ করতেই বেরিয়েছিল। যে যে পথ দিয়ে স্কট গিয়েছিলেন,

সেখানে সেখানে স্মৃতি-চিহ্ন পোঁতা ছিল। সেই স্মৃতি-চিহ্ন অনুসরণ করে দক্ষিণ-মেরুতে এসে তারা দেখে যে, ক্যাপ্টেন স্কট আর তাঁর সঙ্গীরা সেই অনন্ত শুভ্র নির্জ্জনতার মধ্যে হারিয়ে গেছেন। বরফের নীচে অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁদের হাড় পাওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে পাওয়া গেল, একটা চামড়ার বাক্সে একখানা ডায়েরী। ক্যাপ্টেন স্কট সেই ডায়েরী লিখতেন, মৃত্যুর অব্যবহিত মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও ডায়েরী লিখেছেন। ডায়েরীর শেষ পাতায় লেখা, "গত এক মাস আমরা যে কষ্ট পেয়েছি, আমি ভাবতে পারি না, কোনও মানুষ কোনও দিন সে-রকম কষ্ট সহ্য করেছে কি না। তবুও আজ ভাগ্যের বিরুদ্ধে আমার কোনও নালিশ নেই; যা পেয়েছি, তা মাথা পেতে গ্রহণ করছি......যদি আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম, তা হলে সমস্ত ইংলণ্ড শুনতে পেতো যে ইংলণ্ডের গৌরবের জন্য তার কয়েকজন সন্তান কি কষ্টই না সহ্য করেছে—আমাদের এই মৃতদেহ আর আমার এই লেখা হয়ত জগতে একদিন সে কাহিনীর সাক্ষ্য দেবে—"

এখানে আমরা ক্যাপ্টেন স্কট ও তাঁর বীর অনুচরদের সেই অসীম গৌরব ও বেদনার কাহিনীই বলবো। জ্ঞানের সীমানাকে বাড়াবার জন্য, অজানাকে জানবার জন্য মানুষ যে কি অসাধ্য সাধন করেছে বা করতে পারে, ক্যাপ্টেন স্কটের এই বিষাদময় আবিষ্কারের কাহিনী থেকে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

এই কাহিনী পড়ে তোমরা দেখবে যে, মানুষের জ্ঞানের

সীমানা বাড়াবার জন্যে কি মহাকষ্টই না ক্যাপ্টেন স্কট ভোগ করেছেন, কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার করে যখন ১৯১২ সালে ১৮ই জানুয়ারী তিনি দক্ষিণ-মেরুতে এসে পৌঁছলেন, তখন দেখেন যে তাঁর আসার মাত্র পাঁচ সপ্তাহ আগে নরওয়ে দেশের বিখ্যাত আবিষ্কারক আমুন্‌সেন এখানে এসে নরওয়ে দেশের পতাকা পুঁতে চলে গেছেন। দক্ষিণ-মেরুর প্রথম আবিষ্কর্ত্তার গৌরব সেইজন্য আমুন্‌সেনের, ক্যাপ্টেন স্কটের নয়।

কিন্তু সে গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেও ক্যাপ্টেন স্কটের প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাস জগতে তাঁর নামকে এমন এক উঁচু জায়গায় রেখেছে যে, সেখানে পৌঁছান খুব অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন ইংলণ্ডে ডিভনশায়ারের এক গ্রামে স্কট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষেরা অনেকেই সামুদ্রিক বিভাগে বড় বড় চাকরী করে গিয়েছিলেন। সমুদ্রের প্রতি একটা আকর্ষণ নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

সেইজন্যে ছেলেবেলা থেকেই তিনি জাহাজের কাজ শিখতে থাকেন এবং কিশোর কালেই একটা জাহাজে চাকরী নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করেন।

জাহাজের বড় বড় চাকরীর জন্য ইংলণ্ডে শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। স্কট সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সেই শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগলেন। টর্পেডো ছোড়ায় তিনি দক্ষ হয়ে উঠলেন এবং

যৌবনেই তিনি জাহাজের লেফ্‌টনাণ্টের পদ পান। বত্রিশ বছর বয়সে তিনি লেফ্‌টনাণ্ট থেকে কমাণ্ডার হলেন।

এই সময় জগতের নানা দেশ থেকে দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের নানা রকমের চেষ্টা চলছিল। এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই মানুষ জানতে পেরেছে, শুধু তার উত্তর আর দক্ষিণ কোণের খবর মানুষ তখনও কিছুই পায় নি। কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর জ্ঞানপিপাসু মানবচিত্ত কিছুই অজানা রাখতে চায় না। তাই য়ুরোপের নানা দেশে সেই অজানা দেশকে জানবার জন্যে একটা প্রবল চেষ্টা চলে। কোন্ জাতির লোক আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারে, তাই নিয়ে একটা গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সব জাতিরই মধ্যে চলতে থাকে।

স্কট যখন কমাণ্ডার হন, তখন ইংলণ্ডে দক্ষিণ-মেরু অভিযানের জন্য একটা দল গড়া হচ্ছিল। রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী এই অভিযানটীর আয়োজন করছিলেন। একদিন স্কট লণ্ডনের পথে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় উক্ত সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট স্যার ক্লেমেণ্টস্ মার্কাহামের সঙ্গে তাঁর দেখা। তাঁর মুখে তিনি দক্ষিণ-মেরু অভিযানের কথা শুনলেন এবং সহসা তাঁর মনে হল, সেনাপতি হয়ে কি হবে, তার চেয়ে সমুদ্রের ওপারে সেই অজানা দেশের রহস্য ভেদ করতে পারাতেই তো বেশী গৌরব! স্যার মার্কাহামের সঙ্গে পরামর্শ করে স্কট এই অভিযানের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন।

১৯০১ সালে আগষ্ট মাসে "ডিস্‌কভারী" (আবিষ্কার)

নামক জাহাজে স্কট তাঁর দলবল নিয়ে ইংলণ্ড থেকে দক্ষিণ-মেরুর দিকে যাত্রা করেন। সঙ্গে তাঁর আর একজন খুব বড় নাবিক ছিলেন, তাঁর নাম স্যার আর্নেষ্ট স্যাকেল্টন।

দক্ষিণ-মেরুকে জগতের সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে বিধাতা-পুরুষ তার চারদিকে দুর্লঙ্ঘ্য বরফের প্রাচীর গড়ে রেখেছেন। ইংরাজীতে তাকে Great Ice Barrier বলে। এই বরফের প্রাচীর সমুদ্রের জলের উপর ভেসে থাকে। তার ওপারে জাহাজ নিয়ে আর মানুষ যেতে পারে না। মাঝে মাঝে এই বরফের প্রাচীরে ফাঁক দেখা যায়, বরফ তখন গলতে থাকে ; এই সময় এক মহাবিপদ যে এই এক একটা বরফের চাঁই এক একটা পাহাড়ের মত—কোনও ক্রমে জাহাজ যদি সেই পাথরের চাঁইয়ের সম্মুখে এসে পড়ে, তাহলে জাহাজ নিমেষে কোথায় তলিয়ে যাবে।

ক্যাপ্টেন স্কট তাঁর দল শুদ্ধ সেই বরফের প্রাচীরের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, কিন্তু বরফের মধ্যে দিয়ে যাবার কোনও পথ না দেখে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হলেন এবং ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কিং এডওয়ার্ড দ্বীপে নঙ্গর ফেলে রইলেন। তখন দুরন্ত শীত, সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে গেছে। তাঁরা ঠিক করলেন যে আব কিছুদিন পরে শ্লেজে করে যাত্রা করা যাবে।

সেই দ্বীপ থেকে তাঁরা শ্লেজে যাবার আয়োজন করতে লাগলেন। সময় কাটাবার জন্যে তাঁরা নিজেরা নাটক রচনা

তুষার প্রাচীর। দূরে কাপ্তেন স্কটের জাহাজ —৬

করে নিজেরাই অভিনয় করতে লাগলেন। একদল হাতে লিখে একখানা কাগজ বার করলেন, তার নাম হলো South Polar Times.

এই রকম করে মাস কয়েক কাটিয়ে ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে শ্লেজ-যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে গেল। ঠিক হলো যে তাঁরা তিনজনে, স্কট, শ্যাকেল্টন ও উইল্‌সন,—মাত্র এই তিনজনে যাত্রা করবেন এবং সঙ্গে উনিশটা কুকুর নেওয়া হবে।

যাত্রা সুরু হলো সেই অনির্দ্দেশ্য দেশের দিকে। কিছুদূর যেতে না যেতেই নানা প্রকারের বাধা আসতে লাগলো। সাধারণ অবস্থায় যেখানে পাঁচমাইল পথ অতিক্রম করা যায়, সেখানে এক মাইলের বেশী তাঁরা অগ্রসর হতে পারলেন না। বরফের মধ্যে মাঝে মাঝে সহসা গোপন গহ্বর দেখা দেয়—যেই সেখানে পা দিয়েছ, অমনি একেবারে অতল সমুদ্রের তলায় কোথায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে!

তবুও সেখানে তাঁরা এগোতে লাগলেন। যেখান দিয়ে যান, সেখানে কয়েক মাইল অন্তর তাঁবু ফেলে খাবার রেখে যান এবং প্রত্যেক তাঁবুর ওপরে একটা করে পতাকা গুঁজে রাখেন, কারণ ফেরবার সময় যখন খাবার দরকার হবে তখন এই সমস্ত তাঁবু থেকেই পাওয়া যাবে এবং ফেরবার পথেরও নিশানা হবে। এই রকম করে তাঁবু ফেলে এবং প্রত্যেক তাঁবুতে ফেরবার পথের খাবার সংস্থান রেখে তবে অগ্রসর

হতে হয়। কারণ সেই জনমানবহীন, সেই তৃণশস্পহীন তুষারের মরুভূমিতে খাদ্যের অভাব এক অতি ভয়ানক সমস্যা। লক্ষ মুদ্রা সঙ্গে থাকলেও সেখানে এক কণা খাদ্য মিলবে না।

সমস্ত নভেম্বর আর ডিসেম্বর মাস তাঁরা সেই বরফের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। যতই এগুতে লাগলেন, ততই বরফের ঝড় তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। মাঝে মাঝে ঝড়ের এত বেগ হয় যে তাঁবু উড়ে যায়, তখন আবার তাঁবু ফেলতে হয়, আর সেই ঝড়ে যেখানে একটু খালি গায়ে বরফের কুঁচি লাগে সেই খানটাই অসাড় হয়ে যায়। কুকুরগুলো ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসতে লাগলো। এই রকম অবস্থায় আর বেশী দূর এগোনা যায় না দেখে স্কট ফিরলেন। ফেরবার পথে বিপদ আরও ঘনিয়ে এলো। স্যাকেল্টনের হলো অসুখ; খাবারের ডিপোগুলো এত দূরে দূরে পোঁতা হয়েছিল যে এক ডিপো থেকে আর এক ডিপো পৌঁছতে সবাই ক্ষুধায় অবসন্ন ও অজ্ঞান হয়ে পড়তে লাগলো। বিশেষ করে কুকুরগুলো—তারা অবশ হলে তো আর চলবে না, কারণ তারাই স্লেজ টেনে নিয়ে চলেছে। সেইজন্যে কুকুরদের খাবার জোগাবার জন্যে নিরুপায় হয়ে তাঁরা এক একটা কুকুরকে মেরে তারই মাংস অপর কুকুরগুলোকে খাওয়াতে লাগলেন। এই রকম করে তাঁরা কোনও রকমে জীবন নিয়ে সে যাত্রা আবার কিং এডওয়ার্ড দ্বীপে ফিরে এলেন।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে স্কট ও ইভানস্   —১

কয়েক মাস সেই দ্বীপে কাটিয়ে স্কট আবার যাত্রা সুরু করলেন। এবার সঙ্গে মাত্র দুজন সাথী, ইভান্‌স্‌ আর লাস্‌লী। এবার চাকাওয়ালা শ্লেজে যাত্রা করলেন, সঙ্গে কোনও কুকুর নিলেন না। কিন্তু অনেকদূর যাবার পর খাদ্যের সংস্থান ফুরিয়ে আসতে লাগলো ; এবারেও তাঁরা ফিরতে বাধ্য হলেন।

এবারে ফেরবার পথে কিন্তু তাঁরা তিনজনেই মৃত্যুর হাত থেকে ভয়ানক বেঁচে যান। খুব সাবধান হয়ে চলতে চলতে সহসা একটা গোপন গর্ত্তে স্কট পড়ে যান। স্কট ছিলেন আগিয়ে, তাঁর পেছনে ছিলেন ইভান্‌স্‌, আর ইভান্‌সের পিছনে ছিলেন লাস্‌লী। প্রত্যেকেরই কোমর প্রত্যেকের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। স্কট পড়ে যেতেই ইভান্‌স্‌ও সেই সঙ্গে পড়ে যান। লাস্‌লী দৈবক্রমে শ্লেজ শুদ্ধ গর্ত্তের মুখে আটকে পড়েন। শ্লেজটা দৈবক্রমে লম্বালম্বি ভাবে গর্ত্তের মুখে আটকে পড়েছিল। নীচে একেবারে অতল সমুদ্র, তখনি হয়ত তাঁরা সব কোথায় তলিয়ে যাবেন। সেই সময়ে সেই অবস্থায় ঝুলতে ঝুলতে স্কট যৌবনের শিক্ষার বলে একটা বরফের চাঁই আঁকড়ে ধরে তারই ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ান। তারপর বরফ আঁকড়ে কোনও রকমে ওপরে গিয়ে দুই বন্ধুকে উপরে টেনে তোলেন। সে যাত্রা তিনজনেই এইভাবে দৈব কৃপায় বেঁচে গিয়েছিলেন। শ্লেজটা যদি লম্বালম্বি ভাবে গর্ত্তে আটকে না যেত, তা হলে সেইক্ষণেই তাঁদের অস্তিত্ব জগৎ থেকে লোপ পেয়ে যেত।

১৯০৩ সালের শেষাশেষি তাঁরা তাঁদের জাহাজে ফিরে

এলেন এবং ঠিক করলেন যে, এবারকার মত ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু নতুন বিপদ ঘটলো। সামনের পথ সমস্ত বরফে বন্ধ হয়ে গেছে। বারো মাইল পর্য্যন্ত ঘন বরফ পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। নিরুপায় দেখে তাঁরা নানারকমের যন্ত্র নিয়ে সেই বরফের মধ্যে কেটে কেটে পথ তৈরী করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুদিন এ চেষ্টা করার পর বুঝলেন যে, এ অসাধ্য সাধন। দৈব ক্রমে সেবার খুব শীগগির শীগগির বরফ গলতে আরম্ভ করলো এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই স্কট দেখেন যে বরফ গলে তাঁদের যাবার পথ তৈরী হয়ে গেছে। সেবারকার মত যাত্রা সাঙ্গ করে তাঁরা ইংলণ্ডের দিকে ফিরলেন। তাঁরা এ যাত্রায় যতদূর পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন, তার আরও ৪৬৩ মাইল দূরে ছিল দক্ষিণ-মেরু। কিন্তু এর আগে কেউ আর দক্ষিণ-মেরুর এত কাছে আসতে পারে নি।

ইংলণ্ডে ফিরে এসে স্কট যথেষ্ট সম্মান পেলেন। তিনি যতদূর পর্য্যন্ত যেতে পেরেছিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গার বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন। ফিরে আসার পর তাঁকে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করা হয় এবং স্বয়ং সম্রাট এডওয়ার্ড তাঁকে বালমোরাল প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন।

তারপর কিছুকাল ক্যাপ্টেন স্কট বিবাহাদি করে পুত্র কন্যাদের নিয়ে শান্ত ভাবে ঘর সংসার করতে থাকেন। সামুদ্রিক বিভাগে সর্ব্বোচ্চ পদের দিকে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন, কিন্তু যাদের রক্তে থাকে সমুদ্রের ডাক,

ঘরের কোনও মায়া, যশের কোনও মোহ তাদের এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারে না। সমস্ত কাজের মধ্যে, সংসারের সমস্ত সুখশান্তি ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ক্যাপ্টেন স্কটের মন যেন শুনতে পেত, দূর সাগরের পারে চির-তুহিনের দেশে কে তাঁকে যেন ডাকচে, সেই অজানা সাগরের তীরে, সেই অজানা দেশের মাটিতে যেন তাঁর চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষার ধন লুকিয়ে আছে।

স্যার আর্নেষ্ট স্যাকেল্টনেরও সেই অবস্থা। তিনি ১৯০৮ সালে নিজের দল নিয়ে আবার দক্ষিণ-মেরুর দিকে রওয়ানা হলেন, কিন্তু এবারও তাঁকে ফিরে আসতে হলো। তবে তিনি এবার আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর ৯৭ মাইল যেতে পারলেই স্যার স্যাকেল্টনের ভাগ্যেই দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের প্রথম গৌরব লেখা থাকতো।

ক্যাপ্টেন স্কট যখন শুনলেন যে স্যার স্যাকেল্টনও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন, তখন তিনি আর ঘরে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারলেন না, তিনি ঠিক করলেন যে এবার তিনি যাত্রা করবেন, হয় দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবেন, নয় ইংলণ্ডে আর ফিরবেন না। এবার স্কট দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডে আর ফেরা হলো না। দক্ষিণ-মেরুকে তিনি প্রাণ-মন দিয়ে চেয়েছিলেন, দক্ষিণ-মেরু ছিল তাঁর কল্পনার স্বর্গলোক, তাই দক্ষিণ-মেরুতেই, তাঁর যৌবনের জীবনের আকাঙ্ক্ষিত ধ্যানলোকেই চিরকালের মত রয়ে গেলেন।

দক্ষিণ-মেরুর ঝড়ো হাওয়ায়, তার তুষারের প্রতি কণায় ক্যাপ্টেন স্কট ও তাঁর বীর অনুচরদের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তখন তিনি সামুদ্রিক বিভাগের আরও উঁচু পদে উন্নীত হয়েছেন। সম্মুখে তাঁর ইংলণ্ডের সামুদ্রিক বিভাগের সর্ব্বোচ্চ সম্মান; কিন্তু ঘরের সমস্ত আরাম, যশের সমস্ত শান্ত মোহ মন থেকে দূরে ফেলে দিয়ে ক্যাপ্টেন স্কট আবার সমুদ্র-যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। সমুদ্র যাদের একবার ডাকে, ঘরে বসে থাকতে তারা আর পারে না।

১৯১০ সালের জুনমাসের প্রথম দিনে দলবল নিয়ে স্কট "টেরানোভা" জাহাজে দক্ষিণ-মেরুর পথে আবার যাত্রা করলেন।

১৯১১ সালের প্রথম দিকে তিনি আবার সেই দুর্লঙ্ঘ্য বরফের প্রাচীরের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন নিদারুণ শীত; সে শীতের ধারণা আমরা কোন মতেই করতে পারি না। যতখানি ঠাণ্ডা হলে জল বরফ হয়ে যায় তারও ৮২ ডিগ্রী নীচে সেখানকার আবহাওয়া।

এখান থেকে দক্ষিণ-মেরু ৩৫০ মাইল দূরে; এই সাড়ে তিনশো মাইল যাওয়া এবং ফিরে আসার আয়োজন করতেই সেপ্টেম্বর মাস এসে গেল। ১৯১২ সালের নববর্ষের প্রথম দিনে আটজন সঙ্গী নিয়ে তিনি দক্ষিণ-মেরুর ১৭০ মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করে শেষ যাত্রার পথে মাত্র চারজন সঙ্গীকে নিয়ে রওয়ানা হলেন।
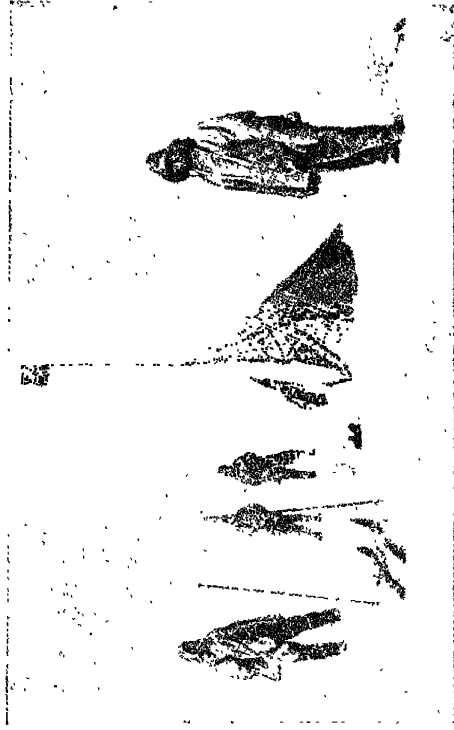
ক্যাপ্টেন স্কট দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেই দেখেন যে কিছুকাল পূর্ব্বেই আমুন্‌সেন্ নরওয়ে দেশের পতাকা উড়িয়ে গেছেন —১২

সঙ্গে যে রশদ নেওয়া হল, তা ডিপোতে ডিপোতে জমা রেখে তাঁরা ক্রমশঃ দক্ষিণ-মেরুর দিকে এগিয়ে চলতে লাগলেন। পথে বিশেষ কোনও বিপদের মধ্যে না পড়ে তাঁরা ১৮ই জানুয়ারী ১৯১২ সালে তাঁদের চির-জীবনের-ইপ্সিত দেশ দক্ষিণ-মেরুতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ক্যাপ্টেন স্কট সেখানে উপস্থিত হয়েই দেখেন যে যেখানে তাঁরা ভেবেছিলেন যে তাঁদের দেশের পতাকা প্রথমে পুঁতবেন, সেখানে নরওয়ে দেশের পতাকা উড়ছে। তাঁদের কয়েক সপ্তাহ আগে বিখ্যাত আবিষ্কারক আমুন্‌সেন দক্ষিণ-মেরুর প্রথম আবিষ্কর্ত্তার গৌরব অর্জ্জন করে চলে গেছেন। সেই জন-মানবহীন অনন্ত তুষারের দেশে নরওয়ের পতাকা আর কাষ্ঠ-ফলকে আমুন্‌সেনের নাম তাঁর বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করছে।

যে গৌরবের আশায় এতদিন ধরে সাধনা করা হয়েছিল, এমনি ভাবে তা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় কার না বুকে বাজে? দক্ষিণ-মেরুর প্রথম আবিষ্কর্ত্তার নামের জায়গায় জগৎ আমুন্‌-সেনেরই নাম লিখে রেখেছে, স্কটের নয়। কিন্তু স্কটের প্রত্যা-বর্ত্তনের করুণ-কাহিনী তাঁর সাধনাকে আমুন্‌সেনের বিজয়ের অনেক উপরে আসন দিয়েছে।

এবার ফেরবার পালা। যাবার সময় আগেই বলেছি, তেমন কোনও বিপদ হয় নি; কিন্তু ফেরবার মুখে পদে পদে ভয়াবহ বিপদ এসে বাধা দিতে লাগলো। হাওয়া আর বইছে না, তার জায়গায় জমাট বরফের কণা। দিনের পর দিন

আকাশ পৃথিবী কিছুই দেখা যায় না, শুধু বরফের বৃষ্টি। আর সে বৃষ্টির বেগ কি! বুঝি পাহাড়কেও টলাতে পারে। চোখে কিছু দেখা যায় না, পায়ে চলা যায় না; অবিরাম, অবিরত তীক্ষ্ণধারে তুষারের বৃষ্টি! সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পাঁচজন লোক চলেছে—পথের দিশা অনন্ত তুষারপাতের মধ্যে হারিয়ে গেছে; খাদ্যের ডিপো যে কোন্ দিকে—কতদূরে, জ্ঞান নেই। অনাহারে সর্ব্বশরীর অবসন্ন। একদিন সেই অবস্থায় প্রথমে ইভান্স্ পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। শুভ্র তুষার এসে তাঁর মৃতদেহের ওপর কবর রচনা করলো। এধারে তুষারপাত প্রতিদিনই বেড়ে চলতে লাগলো। অবশেষে তাঁরা একটা ডিপোতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু বাইরে তখন এত প্রবল ও বিপুল বেগে তুষার বইছে যে, সমস্ত তাঁবু তাতে ডুবে গিয়েছে। তাঁবুর ভেতরে যে খাদ্য ছিল, তাও ফুরিয়ে এলো। যখন একজনের মত আর খাবার আছে, তখন ক্যাপ্টেন ওট্স্ রাত্রিকালে বরফ কেটে সেই দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, তিনি চলে গেলে অন্ততঃ একজনের খাবার তো বাঁচবে! সেই জনমানবহীন প্রান্তরে মৃত্যুর সম্মুখে এত বড় মহানুভবতার উদাহরণ জগতে বিরল। ক্যাপ্টেন ওট্স্ যে সেই রাত্রে বাইরে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। দক্ষিণ-মেরুর তুষারশুভ্র নিশীথে তাঁর অমর-আত্মা এখনও হয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বীর যে, বিপদে সে ভীত হয় না; সেই ভয়াবহ অবস্থার
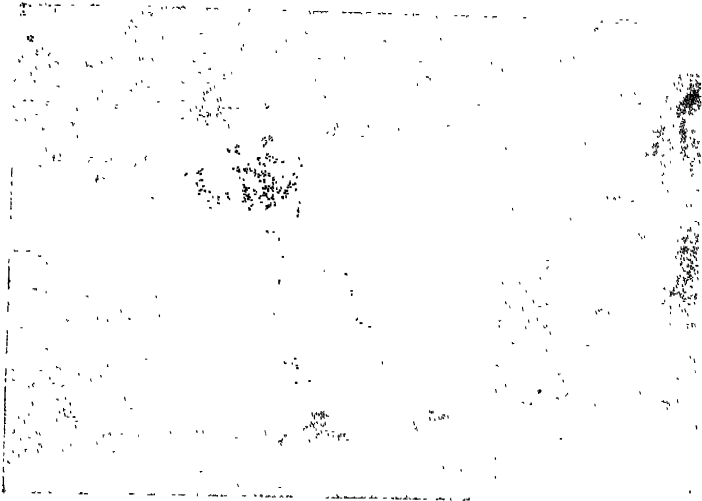
তুষার বৃষ্টির মধ্যে ক্যাপ্টেন ওটস্ —১৪

দক্ষিণ-মেরুর তাঁবুতে ক্যাপ্টেন স্কট —১৫

মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট দুজন সঙ্গীকে নিয়ে ক্যাপ্টেন স্কট অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু দক্ষিণ-মেরুর আকাশ, বাতাস, প্রতি তুষার-কণা তাঁকে হয়ত প্রাণ-মন দিয়ে ভালবেসেছিল, তাই তারা সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে তাঁকে পদে পদে বাধা দিতে লাগলো, যাতে তিনি আর তাদের ছেড়ে না চলে যেতে পারেন। খাবারের ডিপো যখন আরও এগারো মাইল দূরে, তখন অবসন্ন দেহে তাঁরা নিরুপায় হয়ে তাঁদের সঙ্গে যে তাঁবু ছিল, তাই খাঁটিয়ে তার ভেতরে ঢুকলেন। তাঁরা তখন ভাল রকমই জানতেন যে, এই তাঁবুই তাঁদের কবর। পাশের দুজন সঙ্গীর তখন মৃত্যুশ্বাস উপস্থিত, মৃত্যুর হিম-স্পর্শে তখন ক্যাপ্টেন স্কটেরও সর্ব্ব-অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে। মৃত্যুর সেই অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে তিনি তাঁর ডায়েরীর শেষ পাতা লেখেন, "আমার এই লেখার টুকরো আর আমাদের এই মৃতদেহ হয়ত আমাদের কাহিনী একদিন জগতে জানাবে।"

[মেরু-প্রদেশ আবিষ্কার সম্বন্ধে যদি তোমরা আরও বিশদ্‌ভাবে জানতে চাও—তাহলে নিম্নলিখিত বইগুলি অনুসন্ধান করে পড়তে পারো—

The Voyages of Captain Scott by C. Turley. The North Pole by Robert E. Peary. The South Pole by Roald Amundsen. The Voyage of the Discovery by Captain Scott. Artic Exploration by J. D. Hoare.]

কাফ্রীদের দেশ আফ্রিকায়

আফ্রিকার নাম বোধ হয় তোমরা অনেকেই শুনেছ। সেখানকার লোকেদের গায়ের রঙ ভয়ানক কালো, এবং আজও সেখানকার অধিকাংশ লোক বর্তমান সভ্যতার কোনও ধার ধারে না। কয়েক বছর আগেও সেখানে নরখাদক জাতিরা ছিল। তারা আস্ত মানুষ আগুনে পুড়িয়ে পরমানন্দে খেয়ে ফেলতো। জগতের সব চেয়ে বড় মরুভূমি শাহারা এই আফ্রিকায় এবং এত বড় বন্যজন্তুসঙ্কুল দেশ জগতে আর নেই।

মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে সে দেশের কিছুই আমরা জানতাম না। ভয়ে কোনও দিন কোনও লোক সে দেশে পা দেয় নি। বাণিজ্য করবার জন্যে যারা আসতো, তারা বন্দরের ধার থেকেই ফিরে যেত; এত বড় মহাদেশের ভেতর কি আছে, তা দেখবার সাহস কারুর হয় নি।

কিন্তু একজন লোকের সাহস হয়েছিল এবং তাঁর সাহসের জন্যেই আজ আফ্রিকা সমস্ত জগতের কাছে পরিচিত। তাঁর নাম লিভিংষ্টোন এবং তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ-আবিষ্কারক বলে খ্যাত। আফ্রিকা আর লিভিংষ্টোনের নাম এক সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

লিভিংস্টোন ১৮৪০ সালে আফ্রিকায় পদার্পণ করেন এবং

ডেভিড্ লিভিংস্টোন —১৩
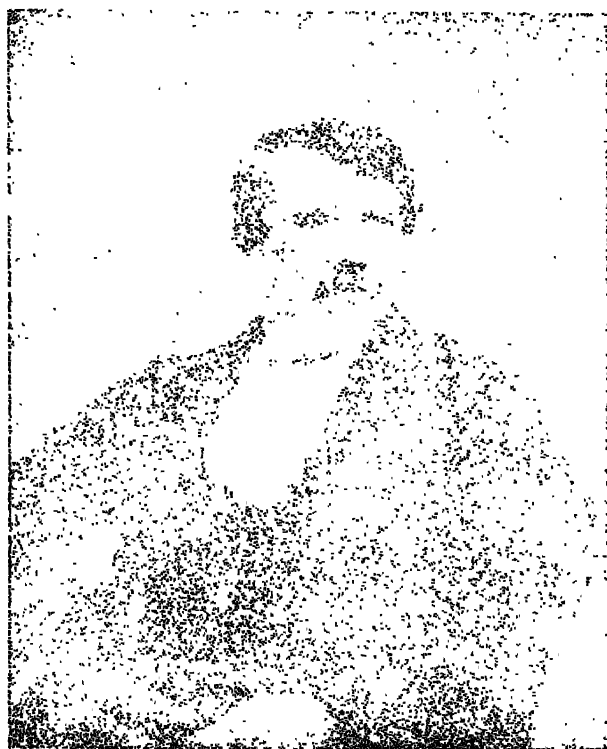
তারপর থেকে একত্রিশ বৎসর কাল তিনি মধ্য আফ্রিকার দেশ হতে দেশান্তরে বিপদের পর বিপদ মাথায় করে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে তিনি সভ্যতার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আফ্রিকার মরুপথে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। মৃত মনে করে জগতের সর্ব্বত্র লিভিংষ্টোনের উদ্দেশে নানা রকমের প্রশংসা-বাণী রচনা করা হলো। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একদল লোকের মনে সন্দেহ হলো যে লিভিংষ্টোন হয়ত মরেন নি। আফ্রিকায় কোথাও কোন কাফ্রীপল্লীতে তিনি হয়ত অবরুদ্ধ হয়ে আছেন। তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্যে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ভয়ানক আন্দোলন চলতে লাগলো। আমেরিকার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাগজ নিউইয়র্ক হেরাল্ডের সম্পাদক ঘোষণা করলেন যে, জীবিত বা মৃত লিভিংষ্টোনের সত্য খবর যিনি খুঁজে এনে দিতে পারবেন, তাঁকে খোঁজার খরচ ছাড়া ষাট হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই সময় ষ্টানলী নামে একজন লোক আমেরিকায় খবরের কাগজের রিপোর্টার হিসাবে খুব নাম করেছিলেন। তাঁর মাথায় ঢুকল যে, যেমন করেই হোক লিভিংষ্টোনকে খুঁজে বার করতে হবে, লিভিংষ্টোনকে যদি জীবিত না পাওয়া যায়, তবুও তাঁর হাড় সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে। এই পণ করে ষ্টানলী আমেরিকা থেকে আফ্রিকায় লিভিংষ্টোনের সন্ধানে আসেন। ষ্টানলী একদিন সত্য সত্যই লিভিংষ্টোনকে খুঁজে বার করেন এবং সেই থেকে ষ্টানলী আর লিভিংষ্টোনের নাম সর্ব্বদাই একসঙ্গে উচ্চারিত হয়।

ষ্টানলী আর লিভিংষ্টোনের মিলন একটা মস্তবড় ঐতিহাসিক ঘটনা। একটা লোক আফ্রিকার বিরাট জঙ্গলের মধ্যে কোথায় আছে, তাকে খুঁজে বার করবার জন্যে পায়ে হেঁটে মরণকে হাতে নিয়ে একেবারে অজানা দেশের ও অজানা লোকদের মধ্যে দিয়ে আর একজন লোক চলেছে। সমস্ত কালোর মধ্যে সে শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় একজন শ্বেতাঙ্গ আছে। আট মাস ভ্রমণের পর একদিন ষ্টানলী মধ্য-আফ্রিকার এক গ্রামে প্রবেশ করলেন। এতদিন যে লোকটীর অনুসন্ধান করে তিনি ফিরেছেন, আজ তিনি খবর পেলেন যে সে-রকম একজন শ্বেতাঙ্গ সেই গ্রামে আছে। উৎসুক-অন্তর নিয়ে তিনি গ্রামে প্রবেশ করলেন। তখন দুপুর। মাথার ওপর আফ্রিকার মরু-সূর্য্য অগ্নি-কিরণ বর্ষণ করছে। এমন সময় দূরে ষ্টানলী দেখেন, একদল কাফ্রীর সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। ষ্টানলী এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে বল্লেন, "আপনিই কি ডাঃ লিভিংষ্টোন ?"

লিভিংষ্টোন শ্বেতাঙ্গ যুবকটীর দিকে চেয়ে বল্লেন, "হাঁ, আমিই ডাক্তার লিভিংষ্টোন।"

ষ্টানলী যখন লিভিংষ্টোনকে খুজে বার করলেন, তখন লিভিংষ্টোন স্থবির, বৃদ্ধ। তার বছর দেড়েক পরেই লিভিংষ্টোন মারা যান। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ষ্টানলী অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু সেই লিভিংষ্টোন বৃদ্ধ জীবনের ও দুর্দ্দশার শেষ-প্রান্তে এসেও আর ঘরে ফিরে যেতে চাইলেন

না। বাকি ক'টা দিনও আফ্রিকার বন্যজন্তুসঙ্কুল পথে-বিপথে তিনি নূতন নূতন দেশ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপৃত রইলেন এবং সেইখানেই, সেই সুদূর আফ্রিকায়, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বজাতি, স্বদেশ হতে দূরে তিনি দেহ-রক্ষাও করেন।

২

লিভিংষ্টোন ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকায় মিশনারী ডাক্তার হয়ে আসেন। দশ বছর মিশনারী ডাক্তারের কাজ করার পর, তাঁর মনে আফ্রিকার অভ্যন্তরের দেশ গুলি আবিষ্কার করবার বাসনা জাগে। ডাক্তারী করবার সময়ই তিনি অনেকবার ভ্রমণে বার হন এবং সেই সময়ই তিনি জাম্বেসী নদী আবিষ্কার করেন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লিভিংষ্টোন ঠিক করলেন যে সোজাসুজী পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত যেতে হবে। অন্তরে সেই বাসনা নিয়ে সঙ্গে দশটা ষাঁড় ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রসহ তিনি রওয়ানা হলেন। আফ্রিকার একেবারে দক্ষিণে কেপটাউন বন্দরে তিনি ডাক্তারী করতেন। কেপটাউন থেকে তিনি উপরের দিকে রওয়ানা হলেন। সামনেই 'কালাহারী' মরুভূমি। অনেকের ধারণা ছিল যে এই মরুভূমি দুরধিগম্য ; কিন্তু ডাঃ লিভিংষ্টোন দেখলেন আফ্রিকার অন্যান্য মরুভূমির মত কালাহারী মরুভূমি তত ভয়াবহ নয়। মাঝে মাঝে মরুদ্বীপ

প্রায়ই আছে। কিন্তু এই মরুভূমির চারিদিকেই ভয়ানক দুর্দ্দান্ত বন্যজন্তু ও ততোধিক দুর্দ্দান্ত আফ্রিকার 'বুনো মানুষের' জাত থাকে। এই মরুভূমির পথ দিয়ে যেতে যেতে কতবার নিস্তব্ধ রাত্রে আশ্রয়-হীন দিগন্ত-ব্যাপী বালুকার মধ্যে দাঁড়িয়ে শুনেছেন, সিংহ গর্জ্জন করছে। সে গর্জ্জনে যেন আকাশের চাঁদ পর্য্যন্ত টলে উঠতো।

মরুভূমি পার হয়ে ১৮৫৩ সালের মে মাসে তিনি লিনিয়ান্তী সহরে এসে পৌঁছেন। ডাক্তার হওয়ার দরুণ লিভিংষ্টোনের সুবিধে হয়েছিল অনেক, কারণ সাধারণতঃ যে সমস্ত লোক একজন শ্বেতাঙ্গ বিদেশী দেখলে হয়ত শত্রুতা করতো, তারাও অসুখ-বিসুখ সারাবার লোভে অনেক সময় ভাল ব্যবহার করতে লাগলো। লিনিয়ান্তীর রাজা লিভিং-ষ্টোনকে খুব সমাদরে তাঁর নিজের কাছে রেখে দিলেন। সেইখান থেকে বেরুতে তাঁর প্রায় নভেম্বর মাস হয়ে গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে লীবা নদী ধরে তিনি ক্রমশঃ পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, তাঁর বাসনা যে পশ্চিম থেকে পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত মাঝখানের সমস্ত দেশটা তিনি আবিষ্কার করবেন।

এই নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে আফ্রিকার বন-জঙ্গলের জীব-জন্তুর অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন। এক রকম পাখীর সন্ধান পেলেন, সেগুলো এমন কর্কশ ভাবে চেঁচায় যে সেখানকার লোকেরা তাকে 'হাতুড়ী-পেটা' বলে ডাকে।

হাতুড়ী-পেটার মত তার গলার আওয়াজ বলে তার ঐ নাম। এই হাতুড়ী-পেটা পাখী কুমীরের ভয়ানক বন্ধু। কুমীরের মুখের ভেতরে নানা রকমের জলের পোকা ঢুকে ভয়ানক অস্বস্তি দেয়। কুমীর জল থেকে মুখ তুলে হাঁ করলেই এই হাতুড়ী-পেটা পাখী নির্ভয়ে কুমীরের মুখের ভেতর ঢুকে যায় এবং সরু লম্বা ঠোঁট দিয়ে পোকার আত্মশ্রাদ্ধ করে। কুমীরও এদের কিছু বলে না। পোকা বেছে এরা আবার উড়ে চলে যায়। আর এক রকম মজার পাখী দেখতে পেলেন, সেগুলোকে 'সাপপাখী' বলে। পাখীর মত মুখ তাদের, সাপের মত দেহ এবং জলে মুখ তুলে এরা খুব ভাল সাঁতার দিতে পারে।

এই নদীর চারিদিকের অরণ্যে আফ্রিকার সমস্ত বন্য জন্তু দলে দলে ঘুরে বেড়ায়। বড় বড় শিকারীদের কাছে এই সমস্ত জঙ্গল, একেবারে নন্দন-কানন; কেননা এখানে শিকারের উপযুক্ত সব রকম জন্তুই আছে এবং শুধু আছে নয়, প্রচুর পরিমাণে আছে। এই অরণ্যের মধ্য দিয়ে যাবার সময় লিভিংষ্টোনের সঙ্গে ওখানকার দুটী মেয়ে-শাসকের পরিচয় হয়। আফ্রিকার মধ্যে এখনও অনেক জায়গা আছে—যেখানে বংশপরম্পরায় মেয়েরাই শাসক হয়ে আসছে। এই দুজন রাণীরই লিভিংষ্টোনকে খুব ভাল লাগে এবং তারা কোন মতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না।

এদের হাত থেকে কোন রকমে উদ্ধার পেয়ে লিভিংষ্টোন চিকোবী বলে এক জাতের রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। এই

চিকোবীদের সঙ্গে যারা দাস-ব্যবসায় করতো তাদের যোগা-যোগ ছিল। এরাই দাস-ব্যবসায়ীদের আড়কাটীর কাজ করতো। দাস-ব্যবসায়ীরা জানতো যে লিভিংষ্টোন ফিরে গিয়ে দাস-প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করবেন এবং দাস-প্রথার ব্যাপার স্বচক্ষে দেখবার জন্মেই তিনি বেরিয়েছেন। সেই জন্মে তারা চিকোবীদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করে ঠিক করলো যে, লিভিংষ্টোন যখন তাঁবুতে বিশ্রাম করবেন সেই সময় তাঁকে আক্রমণ করা হবে।

লিভিংষ্টোন যখন চিকোবীদের দেশে যাচ্ছিলেন তখন অনেকেই তাঁকে সেখানে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু লিভিংষ্টোন নিজের মনকে তৈরী করেই এই অনির্দ্দেশ্য পথে যাত্রা করেছেন। তাই তিনি কারুর কথায় ভীত না হয়ে চিকোবীদের দেশে প্রবেশ করলেন।

লিভিংষ্টোন তাঁবুতে বসে আছেন, এমন সময় কয়েকজন কাফ্রী এসে তাঁর জিনিষ-পত্তর লুঠ করতে লাগলো। তিনি কারুকে কিছু না বলে বা কারুকে কোনও বাধা না দিয়ে কোলের ওপর বন্দুকটী রেখে পরম নিশ্চিন্ত মনে বসে রইলেন। কাফ্রীগুলো তাঁর সাহস দেখে একেবারে দমে গেল এবং কাফ্রীদের ভাষায় তিনি তাঁর উদ্দেশ্যের কথা তাদের কাছে বুঝিয়ে বলতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেল। আপনা থেকেই লিভিংষ্টোন তাদের একটা ষাঁড় খাবার জন্মে উপহার দিলেন। সেখানে আর কোনও গণ্ডগোল হলো না।

লিভিংষ্টোন যখন পশ্চিম উপকূলের নিকট লিওণ্ডাতে এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁর শরীর একদম ভেঙ্গে পড়েছে। এই পথ অতিক্রম করে আসতে তাঁর কুড়িবার ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। লিওণ্ডায় কিছুদিন থেকে একটু সুস্থ হয়ে তিনি আবার লিনিয়ান্তীর দিকে ফিরে চল্লেন। ফিরে আসবার পথে এবার আর চিকোবীদের দেশে গেলেন না। এবারেও তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ফেরবার পথে মুরগীর মত এক রকম পাখী দেখতে পেলেন। পাখীগুলো ময়ূরের মতনই সাপের ভয়ানক শত্রু। লম্বা লম্বা ঠোঁট, সাপের মাথায় একবার ঠোক্কর দিলেই সাপ আহত হয়ে পড়ে যায়। কিন্তু পথে আর একটা জিনিষ দেখে লিভিংষ্টোনের মনে ভয়ানক কষ্ট হল। এমন অনেক গ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হল, যেখানে দেখেন যে কুঁড়ে ঘর সব ভাঙ্গা অবস্থায় সারি সারি পড়ে রয়েছে, কিন্তু কোথাও একটী জনপ্রাণী নেই। দাস-ব্যবসায়ীরা এসে সব ধরে নিয়ে গেছে।

লিনিয়ান্তীতে ফেরবার পথে আবার সাতবার তাঁর জ্বর হয়। সমস্ত শরীর ক'খানি হাড়ে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু তবুও তাঁর মনের কোনও অবসাদ নেই। লিনিয়ান্তী পৌঁছেই তিনি ঠিক করলেন যে এবার জাম্বেসী নদী ধরে পূর্ব্বদিকে যেতে হবে।

লিনিয়ান্তী ছেড়ে কয়েকদিন যাত্রা করার পর লিভিং-ষ্টোন দূরে একটা অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলেন। তিনি দেখলেন যে, দূরে আকাশে ধোঁয়ার স্তম্ভের মত কি দেখা যাচ্ছে।

অনেকগুলি স্তম্ভ উঠেছে, সবগুলির মাথা মেঘের মধ্যে গিয়ে হারিয়ে গেছে। সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে লিভিংষ্টোন সেই ধোঁয়ার স্তম্ভকে লক্ষ্য করেই চলতে লাগলেন। যতই এগুতে লাগলেন, ততই তাঁর কাণে একটা কিসের শব্দ আসতে লাগলো। শব্দটা যে মাঝে মাঝে হচ্ছে তা নয়, ক্রমান্বয়ে একটা গভীর শব্দ সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিক থেকে আসছে এবং যতই এগুচ্ছেন শব্দ ততই গুরু গম্ভীর হয়ে উঠছে। সঙ্গে যে সমস্ত কাফ্রী ছিল, তারা লিভিংষ্টোনকে এগুতে বারণ করলো। তাদের বাপ ঠাকুর্দ্দা সকলেই ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে আসছে আর ঐ শব্দ শুনে আসছে। ও সব দৈত্য-দানাদের ব্যাপার!

লিভিংষ্টোন অবশ্যই জানতেন যে, এই সব ধারণা কাফ্রীদের কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি যতই এগুতে লাগলেন, শব্দ ক্রমশঃ গর্জ্জন হয়ে উঠতে লাগলো। এত গভীর গর্জ্জন তিনি জীবনে কখনও শোনেন নি। ক্রমশঃ যখন তিনি ঈপ্সিত স্থানের খুব কাছে এগিয়ে এলেন, তখন সামনের দৃশ্য দেখে তাঁর দেহ মন ও আত্মা সমস্ত জুড়িয়ে গেল। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত অবিরল ভাবে অনাদি কাল হতে গর্জ্জন করে চলেছে। কেউ তার খবর রাখতো না। লিভিংষ্টোনই জগতের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিত লোক—যিনি সেই বৃহৎ জলপ্রপাতের সম্মুখে প্রথম সেদিন গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

ভীষণ বেগে সহস্র ধারায় অতি উচ্চ থেকে এই অবিরল জলস্রোত অবিরাম হুঙ্কারে নীচে নামছে। প্রথম দিকটাতেই এই জলের স্রোত এক মাইলের চেয়ে বেশী চওড়া ৪৩০ ফিট উঁচু থেকে নেমে এক জায়গায় জড় হয়ে, সেখান থেকে একেবারে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে। আর এই আছড়ে পড়ার শব্দ এত ভীষণ ও তীব্র যে তা সহ্য করা যায় না। এই জল-প্রপাতের নামই 'ভিক্টোরিয়া ফল্স্' ;—জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত।

সেখান থেকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে লিভিংষ্টোন দেখতে পেলেন যে সামনে চারিদিকে এক বিচিত্র রকমের বহু কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখেন যে, সেগুলো কুঁড়েঘর মোটেই নয়—সেগুলো উইটিপি। এত বড় উইটিপি জগতের আর কোথাও দেখা যায় না। এক একটা টিপি বেড়ে প্রায় ৫০ ফিট এবং উঁচুতে প্রায় ২০ ফিট, তার মানে চারটে মানুষের সমান। সেখান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতে লিভিংষ্টোন দেখেন, একদল বুনো ষাঁড় এগিয়ে আসছে। আফ্রিকার জঙ্গলের এই সমস্ত বুনো ষাঁড় বড় ভয়ানক রাগী জন্তু আর এদের শিঙের এত জোর যে হাতীকেও এরা শিঙে করে তুলে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। একবার ক্ষেপে গেলে আর এদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। লিভিংষ্টোনের দলের একজন কাফ্রী কি মনে করে একটা দল ছাড়া ষাঁড়ের পিঠে বর্শা ঢুকিয়ে দিল। আর যাবে কোথায়?

আহত হয়ে সে তখন লোকটাকে শিঙে করে ওপরে তুলে এমন আছাড় মারলো যে, লোকটা মাটি থেকে বিশ হাত উঁচুতে উঠে, একটা ঝোপে পড়ে গেল। লিভিংষ্টোনের হাতে ছিল বন্দুক, তিনি আর কাল বিলম্ব না করেই ষাঁড়টাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন। গুলির আঘাতে ষাঁড়টা শুয়ে পড়লো। সে যাত্রা তাঁরা রক্ষা পেয়ে গেলেন।

একরকম হাতী আছে তারা জলে থাকতে ভালবাসে, জলে সাঁতার দিতে পারে, তাদের জলহস্তী বলে; কিন্তু লিভিংষ্টোন সাধারণ হাতীকেও সাঁতার কাটতে দেখেন। একবার এক জঙ্গল থেকে তিনটে হাতীকে তাড়া করা হয়। হাতীগুলো জঙ্গল ছাড়িয়ে নদীর ধারে এসে পড়লো। শিকারীরা মনে করলো যে হাতীগুলো এবারে ফাঁদে পড়েছে। কিন্তু হাতীগুলো ঝপাং করে জলে পড়ে শুঁড়গুলো জলের উপরে রেখে অবলীলাক্রমে নদী পার হয়ে গেল।

অনেকবার লিভিংষ্টোনকে অনেক বুনো জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে এবং অনেক সময়ে তার ফলে তিনি আহত হয়ে পড়েছেন। একবার এক সিংহের সঙ্গে তাঁদের লড়াই বাধে। সিংহটা আহত হয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে অতর্কিতে একেবারে লিভিংষ্টোনের ঘাড়ে এসে পড়ে কাঁধে এক থাবা মারে। লিভিংষ্টোন দেখলেন যে, এ যাত্রা আর রক্ষে নেই—কিন্তু তাতেও তিনি বিশেষ চঞ্চল হলেন না। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, আচ্ছা, সিংহটা আগে

দেহের কোন্ অংশটা খাবে! এমন সময় এক সাহসী কাফ্রী বর্শা দিয়ে সিংহটাকে মারতেই সিংহটা লিভিংষ্টোনকে ছেড়ে তার দিকে লাফিয়ে পড়লো। তখন সবাই মিলে তাকে আক্রমণ করাতে সে পরাজিত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত দেহে মরে পড়ে গেল।

কিন্তু বনের পশুর চেয়ে আফ্রিকার অসভ্য কাফ্রীদের নিয়েই তাঁর বিপদ হতো সকলের চেয়ে বেশী। অনেকে তাঁকে মানুষ বলেই মনে করতো না; তারা ভাবতো যে লোকটা নরক থেকে উঠে এসেছে। তার কারণ এর আগে কখনও এরকম শাদা লোক আর তারা দেখেনি। তাই তারা ভাবতো যে, এ লোকটা এসেছে তাদের বিপদগ্রস্ত করতে। একবার লিভিংষ্টোন একজন কাফ্রীর জ্বর হয়েছে দেখে তাকে ওষুধ খেতে দেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ধারণা হলো যে লিভিং-ষ্টোন নিশ্চয়ই তাদের আত্মীয়কে বিষ খাইয়েছে। এই তো তারা মার-মূর্ত্তি! লিভিংষ্টোন তখন অনেক বুঝিয়ে তবে শান্ত করেন এবং লোকটার জ্বর পরের দিন ছেড়ে যেতে তারা তবে বিশ্বাস করে। কিন্তু এই বিশ্বাস করার পর তারা একেবারে তাঁর গোলাম হয়ে গেল। তাদের কাছে লিভিংষ্টোন ক্রমশঃ একটা দেবতা হয়ে উঠতে লাগলেন। তাদের ধারণায় লিভিংষ্টোন একটা অসাধারণ লোক হয়ে উঠলেন, তিনি সব কিছুই করতে পারেন। কাফ্রীরা কখনও ঘড়ি দেখেনি—লিভিংষ্টোন যখন তাদের ঘড়ি দেখালেন,

তখন তো তারা অবাক! এরকমের জন্তুতো তারা আর কখনও দেখেনি!

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে মে লিভিংষ্টোন আফ্রিকার সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে ভগ্নস্বাস্থ্যে ইংলণ্ডে ফেরেন। ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁকে প্রচুর সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করলো। লণ্ডন নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরিকের সম্মান তাঁকে দেওয়া হল। নানাদিক দিয়ে তিনি নানা সম্মান পেতে লাগলেন। তিনি যখন আফ্রিকায় যান তখন তিনি সেখানকার এক পাদ্রীর মেয়েকে বিয়ে করেন; কিন্তু যখন তিনি পরিভ্রমণে বের হন তখন স্ত্রী-পুত্রকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেন। ইংলণ্ডে ফিরে এসে লিভিংষ্টোন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে প্রচুর গৌরব ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু কয়েকমাস যেতে না যেতেই ঘরের শান্ত জীবন তাঁর আর ভাল লাগলো না— ইংলণ্ডে সুন্দর পল্লী-নিকেতন ছেড়ে তাঁর মন আফ্রিকায় বন্য-জন্তুভরা ব্যাধির বীজে-পরিপূর্ণ দুর্গম বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। সভ্যতার পীঠস্থান থেকে তাঁর মন সেই বন্য বর্ব্বতার মধ্যে ফিরে যাবার জন্য আকুল হয়ে উঠলো। তাঁর মনে হলো যে এই দুর্গম সাধনা করে অসভ্য কাফ্রীদের কাছেও সভ্যতার আলোক পৌঁছে দিতে হবে। তারাই বা কেন এই বৃহৎ সভ্যতার বাইরে বন্যজন্তুদের মত বাস করবে?

লিভিংষ্টোনের আর ঘরে থাকা হলো না। স্ত্রী-পুত্র, ইংলণ্ডের সমস্ত সমাদর, ঘরের সমস্ত মায়া ত্যাগ করে তিনি

আবার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকায় রওয়ানা হলেন। এবার গিয়ে তিনি বহু হ্রদ, নদী আবিষ্কার করেন এবং স্থানে স্থানে বৃটীশ মিশনারীদের থাকার জন্যে কেন্দ্রও স্থাপনা করেন। কাফ্রীরা লিভিংষ্টোনের ব্যবহারে এতখানি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি যা বলতেন তারা তাই শুনতো। শাদা চামড়ার প্রতি রাগ আর ভয় তাদের চলে গেল।

এইবার গিয়ে একটা মজার ঘটনা দেখেন। প্রথমবার চলে আসবার সময়, লিভিংষ্টোন তাঁর ওষুধ-পত্তর এবং অন্যান্য জিনিষ এক যায়গায় গাদা করে ফেলে রেখে এসেছিলেন। দুবচ্ছর পরে ফিরে গিয়ে দেখেন যে সেই সমস্ত জিনিষ-পত্তর সেখানে ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে। কেউ তাতে হাত পর্য্যন্ত দেয়নি।

কিন্তু একটা জিনিষ দেখে ভয়ানক দুঃখ হলো। দু'বচ্ছর আগেও যে সমস্ত গ্রাম তিনি বেশ সমৃদ্ধ দেখেছিলেন, এবার এসে দেখেন যে, সে-সমস্ত শূন্য হয়ে পড়ে আছে। গ্রামের পর গ্রাম, কিন্তু তাতে একটীও লোক নেই। যেখানে কাফ্রীরা থাকতো সেখানে বন্যজন্তুরা এসে রাত্রে ঘুমোয়। দাস-ব্যবসায়ীরা সব ধরে নিয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দাস-ব্যবসায়ীদের হঠাৎ দেখা হয়ে যেত। দেখতেন, শেকল দিয়ে বেঁধে দলে দলে কাফ্রীদের তারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। লিভিংষ্টোন এ দৃশ্য দেখতে পারতেন না। দাস-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর দলের যুদ্ধ বেঁধে

যেত এবং সহসা আক্রান্ত হয়ে দাস-ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ যায়গাতেই কাফ্রীদের ফেলে পালাত। এই রকম করে তিনি অনেক কাফ্রী ক্রীতদাসকে রক্ষা করেন। অনেক সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, কাফ্রীদের দলপতিরাই মাঝে মাঝে সাহেব-দের তৈরী জিনিষের লোভে লুকিয়ে ছেলেদের ধরিয়ে দিত। একটা ঘড়ি পেলেই হয়ত তারা একটা ছেলেকে দিয়ে দিত। লিভিংষ্টোন এই সমস্ত ভয়াবহ ব্যাপারের কথা লেখালেখি করে এই জঘন্য ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের জনমত গড়ে তোলেন। ১৮৬২ সালে আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতেই তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ পান। এই সংবাদে তাঁর মন ভেঙ্গে পড়ে বটে ; কিন্তু তাতেও তিনি বিচলিত না হয়ে আপনার কাজ করে যেতে লাগলেন।

নায়সা হ্রদ আবিষ্কারের সময় তিনি একদিন দেখেন যে, দূরে ধোঁয়ার মত মেঘের টুকরো মাটি থেকে উঠছে। কাছে গিয়ে দেখেন যে, রাশি রাশি ছোট ছোট পোকার স্তূপ। এই সমস্ত পোকা পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। রাত্রে জাল টাঙ্গিয়ে এদের ধরে রাখা হয়, দিনের বেলা সেগুলি দিয়ে পিঠে তৈরী হয়। কাফ্রীদের কাছে এই পিঠে বড়ই সুখাদ্য।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে লিভিংষ্টোন দ্বিতীয়বারের মত ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। তখন তিনি বয়সে বৃদ্ধ না হলেও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছেন। কাফ্রীরা মনে করতো যে,

তাঁর গায়ে মাংস নেই—সেই জন্যেই লজ্জায় গায়ে সর্ব্বদাই কাপড় ঢাকা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেই জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যেও ইংলণ্ডে তাঁর সুস্থির হয়ে বসবাস করা চল্লো না। তিনি আবার চল্লেন—আফ্রিকার দিকে। এবার তাঁর বাসনা আফ্রিকার ভেতর দিকে একেবারে চলে যাওয়া। কোনও লোকই তাঁর এ সঙ্কল্পে বাধা দিতে পারলো না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয়বার এবং শেষবারের মত ইংলণ্ড ছেড়ে আফ্রিকার দিকে রওয়ানা হন।

অন্য দুবার তাঁর সঙ্গে প্রথম প্রথম অবস্থায় দু'তিন জন করে স্বদেশবাসী সঙ্গী নিয়েছিলেন; কিন্তু এবার তিনি একেবারে একা রওয়ানা হলেন। আফ্রিকায় এসে তিনি আঠারো জন কাফ্রী এবং বারোজন বোম্বের সিপাই সঙ্গে করে জাঞ্জিবার থেকে একেবারে ভিতরের দিকে রওয়ানা হলেন। বোম্বের গভর্ণর লিভিংষ্টোনের সঙ্গে থাকবার জন্যে এই বারোজন সিপাইকে উপহার দেন। মানুষ ছাড়া তাঁর সঙ্গে এবার ছ'টা উট, তিনটী মোষ, দুটী অশ্বতর আর তিনটী গাধা ছিল। কাফ্রীরা এর আগে কখনও গাধা দেখেনি। তাই গাধার বিকট ডাক শুনে তারা হেসে লুটোপুটী খেতো।

যাত্রার প্রথমটা বেশ ভালই মনে হল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতে নানারকমের বিপত্তি দেখা দিতে লাগলো। দেশী সিপাইগুলো কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই খাবারের অভাবে ও সেই বুনো ম্যালেরিয়ার তাড়নায়

পালালো। লিভিংষ্টোনের নিজেরও আবার ভয়ানক জ্বর হলো এবং যতই তিনি এগুতে থাকেন, ততই জনমানবশূন্য গভীর অরণ্য অথবা নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্যে গিয়ে পড়েন। কোথাও কোন গ্রামের চিহ্নমাত্র নাই, আহারের কোনও সুবিধা নেই। এই সময় তাঁর ওষুধের বাক্সটাও হারিয়ে গেল।

দলে অবশিষ্ট যে কয়জন লোক ছিল, তারা চলতে না পেরে লিভিংষ্টোনের উপর বিরক্ত হয়ে একদিন রাত্রে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে পালায়। সেই জরাজীর্ণ অবস্থায়, সেই নিঃসঙ্গ পথ-রেখাহীন প্রান্তরে, বন্যজন্তুদের মধ্যে লিভিংষ্টোন তাঁর একমাত্র বিশ্বাসী কাফ্রী ভৃত্যের সঙ্গে সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হয়ে চলতে লাগলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, সভ্যজগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক স্থাপন আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, এই জনমানবহীন নিস্তব্ধ প্রান্তরেই দেহত্যাগ করতে হবে; কিন্তু তাই যখন স্থির, তখন নিরুদ্যম হবার কি আছে? যতদূর এগুতে পারা যায়—যতদিন না মৃত্যু এসে এই যাত্রা থামিয়ে দেয়, ততদিন লিভিংষ্টোন ঠিক করলেন যে চলতে হবে, ফেরা আর হবে না।

ওধারে যে সমস্ত লোক লিভিংষ্টোনের জিনিষপত্তর নিয়ে সরে পড়েছিল, তারা জাঞ্জিবারে পৌঁছে রটিয়ে দিলে যে, লিভিংষ্টোনকে কাফ্রীরা খুন করে ফেলেছে।

এই খবর দেখতে দেখতে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়লো।

ইংলণ্ডের খবরের কাগজে হৈ চৈ পড়ে গেল। জগতের সমস্ত কাগজে লিভিংষ্টোন সম্বন্ধে শোক-জ্ঞাপক বহু প্রবন্ধ বেরুতে লাগলো। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিভ্রমণকারীর সঠিক সংবাদের জন্য চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। এই সময় আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাগজ এক পুরস্কার ঘোষণা করলো যে, লিভিং-ষ্টোনের সঠিক সংবাদ যে এনে দিতে পারবে, তাকে ষাট হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই কাহিনীর প্রারম্ভেই আমরা ষ্টানলী ও লিভিংষ্টোনের অপূর্ব্ব মিলনের কথা বলেছি। ষ্টানলী যখন জানালেন যে লিভিংষ্টোন মরেননি, তিনি বেঁচে আছেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখন জগতের কেউই ষ্টানলীর কথা সহজে বিশ্বাস করতে চায় নি।

ষ্টানলী লিভিংষ্টোনকে তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে বহু অনুরোধ করেন। কিন্তু লিভিংষ্টোন কিছুতেই ইংলণ্ডে ফিরে যেতে চাইলেন না। তাঁর তখনও বাসনা যে তিনি আফ্রিকার মধ্যে আরও অনেক দেশ আবিষ্কার করবেন। সেই জন্যে যে খাতায় তিনি এ পর্য্যন্ত তাঁর সমস্ত পথের ঘটনা লিখেছিলেন, সেটা ষ্টানলীকে দিয়ে দিলেন এবং নিজে আবার আফ্রিকার পথে-বিপথে নূতন নূতন পথের, নূতন নূতন দেশের সন্ধানে বেরুলেন ; কিন্তু তাঁর জীর্ণ দেহ এ বোঝা আর বেশী দিন বইতে পারলো না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১লা মে চিতাম্বো নামক এক গ্রামে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এবার

তিনি যে মহাদেশের পথে রওয়ানা হলেন, সেখান থেকে আর তাঁর খবর আনবার আর কোনও পথ রইল না। আফ্রিকার মাটিকে তিনি সভ্যজগতের কাছে পরিচিত করে দিয়ে গেছেন—আফ্রিকার মাটিকে তিনি জন্মভূমি ইংলণ্ডের চেয়েও ভাল-বাসতেন—তাই সেইখানেই তিনি তাঁর প্রিয় কালো কাফ্রীদের মধ্যে দেহ-ত্যাগ করেন।

তাঁর দেহাবশিষ্ট রাজকীয় সম্মানে ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার গির্জ্জাতে সমাধিস্থ করা হয়।

[আফ্রিকার আবিষ্কার সম্বন্ধে ইংরাজীতে অনেক বই আছে। তার মধ্যে নিম্নলিখিত বইগুলি তোমরা পড়ে দেখতে পারো—

The story of Africa and its Explorers by R. BROWN. How I found Livingstone by SIR STANLEY. In Darkest Africa by SIR STANLEY. Life of Bruce by SIR F. HEOD.]

মঙ্গো পার্ক

আজ আমরা স্কুলের বেঞ্চে বসে নির্ভাবনায় যখন ভূগোল, ইতিহাস বা বিজ্ঞান পড়ি, তখন আমাদের মনে থাকে না যে আজ আমরা ছাপার হরফে অনায়াসে যা পড়তে পেয়েছি, তার তথ্য সংগ্রহের জন্য কত লোক প্রাণ দিয়েছে, কত লোক মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। আজ আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, আমাদের এই পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে আর সূর্য্য এক যায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ এই সত্যটুকু প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে আমাদের আগে যুগে যুগে কত লোক কত নির্য্যাতন ভোগ করেছে। যাঁরা প্রথম প্রথম এই সত্য প্রচার করেন, তাঁদের ধরে কারাগারে রাখা হয়েছে, পুড়িয়ে মারা পর্য্যন্ত হয়েছে।

তেমনি আজ ভূগোলের পাতা খুলে যখন আমরা দেশের পর দেশের নাম মুখস্থ করে যাই, তখন ভুলে যাই সেই সমস্ত দেশের নাম জানতে কত লোক প্রাণ হারিয়েছে। যে সমস্ত-পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী আজ আমাদের সকলের জানা, সেই সমস্ত একদিন আমাদের অধিকাংশেরই অজানা ছিল। কোথায় কোন্ নদী উঠেছে, কি ভাবে কোথা দিয়ে গিয়ে কোথায় পড়েছে, কোন্ সাগরের কূলে কোন্ নগরী আছে, কোন্ দেশে কি লোক আছে, আর কিই বা তাদের চিন্তা আর

ভাবনা, এই সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করবার জন্যে কত লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাঁদের সেই সব অপরূপ আত্মোৎসর্গের ফলেই আজ আমরা অনায়াসে ঘরে বসে বই মুখস্থ করতে পারি।

ক্যাপ্টেন স্কট তাঁর সব সঙ্গীদের নিয়ে জন-মানবহীন দক্ষিণ-মেরুর তুষারে চিরনিদ্রামগ্ন আছেন; লিভিংষ্টোনের আত্মা আজও হয়ত আফ্রিকার জঙ্গলে যে কুঁড়ে ঘরে তিনি দেহত্যাগ করেন, তারই আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অষ্ট্রেলিয়ার দীর্ঘ প্রান্তরে বার্ক, উইলস্‌ ও কিং এর কঙ্কাল ধূলোয় মিশিয়ে রয়েছে; আফ্রিকার নাইগার নদী নিমজ্জিত মঙ্গো পার্কের অসমাপ্ত অন্তর-বাসনা মৃদু মর্ম্মরে আজও হয়ত ঘোষণা করছে।

১৭৭১ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এক গ্রামে মঙ্গো পার্ক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা কৃষির কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালাতেন। সংসারটাও কম ছিল না, তাঁরা ভায়ে-বোনে মিলেই ছিলেন তেরো জন। এই বৃহৎ সংসারের মধ্যে মঙ্গো পার্কের বাবা ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে রীতিমত চেষ্টা করেন এবং পার্ক ছাত্রাবস্থায় সর্ব্বদাই ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। ছেলেবেলা থেকেই গাছপালা তাঁর বড় ভাল লাগতো এবং কিশোরকালেই তিনি বেশ ভালরকম উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শেখেন।

স্কুলের পড়াশোনা শেষ হতেই তাঁর বাবা ঠিক করলেন

মঙ্গোপার্ক -- ৩৬

যে ছেলেকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিয়ে পাদ্রী করে তুলবেন। ছেলের কিন্তু মানুষের মনকে ধর্ম্ম-শিক্ষায় উন্নত করার বাসনা থেকে, মানুষের দেহকে রোগ-মুক্ত করার বাসনা পেয়ে বসলো। বাপ চাইলেন ছেলেকে পাদ্রী হতে, ছেলে চাইলেন ডাক্তার হতে। অবশেষে আঠারো বছর বয়সে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী অধ্যয়নের জন্য ভর্ত্তি হলেন।

সেখান থেকে ডাক্তারী পাশ করে তিনি চাকরীর সন্ধানে লণ্ডনে এলেন। সেখানে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কসের আলাপ হয়ে গেল। স্যার জোসেফ্ সেই সময়কার রয়েল সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট এবং আফ্রিকান্ এসোশিয়েসন নামক সমিতির সভ্য। তাঁর সাহায্যে মঙ্গো পার্ক এক জাহাজে চাকরী পেলেন।

উপরে যে সমিতির কথা বললাম, সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আফ্রিকা সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আবিষ্কারের সহায়তার জন্য। সেই সময় শাহারা মরুভূমির নিম্নবর্ত্তী নাইগার নদীর উৎপত্তি, বিস্তৃতি অথবা তাহার তীরবর্ত্তী দেশসমূহের অবস্থা কি রকম তা কেউই জানত না। অথচ বাণিজ্যের পক্ষে এই নদীর সমস্ত ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কেউই কৃতকার্য্য হওয়া তো দূরের কথা, বেশী দূর এগুতে পারেন নি। শেষ বার গিয়েছিলেন মেজর হাউটন বলে একজন পর্য্যটক, কিন্তু নানা বিপদ্ আপদ্ সহ্য করবার পর সেইখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই

নদীর তীরবর্ত্তী কাফ্রীরা শ্বেতাঙ্গ দেখলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো এবং পদে পদে তারা ভীষণ রকম বাধা দিত, অনেক সময় মেরেই ফেল্‌তো। পর্য্যটকের পর পর্য্যটক গিয়েছে, কিন্তু সবাই ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে। অবশেষে আফ্রিকান্ এসোশিয়েসন ঠিক করলেন যে, আর একজন পর্য্যটককে পাঠিয়ে তাঁরা শেষবারের মত দেখবেন।

মঙ্গো পার্ক সেই সময় ডাক্তারী ক'রে জাহাজ থেকে ফিরেছেন। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখে তাঁর মন সহসা দুলে ওঠে; কে যেন মনের কোণে এত দিন ঘুমিয়েছিল—সমুদ্রের লোণা জলের হাওয়া লেগে সে জেগে উঠেছে। জেগেই সে বলে, আর মাটিতে নয়, ঐ ঊর্ম্মি-মুখর সমুদ্রের পথে চল, চল দেশ-দেশান্তরে, নব নব মানবের মধ্যে, নব নব বৈচিত্র্যের মধ্যে, নব নব বিপদের মধ্যে। ঘরের এ এক-ঘেয়ে জীবনের মধ্যে কোনও আনন্দ নেই, কোনও তৃপ্তি নেই। একটা দুষ্কর কিছু করবার জন্য মঙ্গো পার্কের মন সায় দিয়ে উঠলো।

স্যার জোসেফ্‌কে তিনি সমস্ত বললেন এবং আফ্রিকান এসোশিয়েসন থেকে তাঁকেই পাঠাবার জন্যে চেষ্টা করতে বললেন। যুবকের উৎসাহ দেখে সমিতির লোকেরা সকলেই বিস্মিত হল। অনেক বাদ-বিতণ্ডার পর অবশেষে ১৭৯৫ সালের ২২শে মে চব্বিশ বছর বয়সে মঙ্গো পার্ক মরণ-সঙ্কুল আফ্রিকার অজানা পথে বাহির হলেন।

গাম্বীয়া নদীর উৎপত্তি-স্থলে জিলিফ্রী নামক যায়গায় পার্ক

সর্ব্বপ্রথম অবতরণ করেন। সেখান থেকে নদীর স্রোত ধরে তিনি পিসানিয়ায় উপস্থিত হন। পিসানিয়ায় এক ইংরাজ মিশনারী ডাক্তার ছিলেন। পার্ক তাঁরই অতিথি হ'য়ে সেখান থেকেই যাত্রার সমস্ত আয়োজন করতে লাগলেন। এই আয়োজন করতে প্রায় দু'মাস সময় কেটে যায়; সেই সময়ের মধ্যে পার্ক দেশী ভাষা শিখে নিলেন।

সঙ্গে জন বারো নিগ্রো নিয়ে তিনি ইংরাজ-বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। বিদায় দেবার সময় ডাক্তার বন্ধুর সত্যই মনে হল যে, তিনি যেন পার্ককে শেষ-বিদায় দিচ্ছেন; কারণ তিনি জানতেন যে, এই দেশের ভেতরে যে একবার গেছে সে আর ফিরে আসেনি; ফিরে এলেও, যে সমস্ত বিপদ্ এড়িয়ে আসতে হয়েছে তার যন্ত্রণা মৃত্যুরও অধিক।

পিসানিয়া ত্যাগ করে পার্ক মদিনা নামক কাফ্রীদের এক গ্রামে উপস্থিত হলেন। সেই গ্রামের রাজা তাঁকে খুব সমাদর করে অভ্যর্থনা করলেন এবং অনেক করে জানালেন যে, তিনি যেন বেশীদূর অগ্রসর না হন; কারণ দূর দেশের কাফ্রীরা তাঁকে দেখলেই হয় ত মেরে ফেলবে। কিন্তু মঙ্গো পার্ক তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। মদিনা ত্যাগ করে তিনি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন।

পথে যেতে যেতে কাফ্রীদের জীবনের অনেক রকম অদ্ভুত সব সংস্কার তাঁর চোখে পড়তে লাগলো। এক যায়গায় এসে দেখেন যে, গাছের ডালে ডালে নানা রকমের সব পোষাক

ঝোলান। সঙ্গী কাফ্রীদের জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, এই সমস্ত পোষাক সাধারণ জিনিষ নয়। এই বনের যিনি দেবতা, এ সমস্ত তাঁরই পোষাক। তাঁর নাম মাম্বো-জাম্বো। গ্রামের কোন স্ত্রীলোক যদি কোনও অন্যায় কাজ করে, তবে মাম্বো তাকে ভীষণ শাস্তি দেয়। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে, কোনও স্ত্রীলোক যদি তার স্বামীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, তবে স্বামী এই মাম্বো-জাম্বোর পোষাক পরে গ্রামের সকলের সামনে স্ত্রীকে রীতিমত প্রহার করে। যাতে মাম্বো-জাম্বো তাদের ওপর প্রসন্ন থাকে সেই জন্যে কাফ্রী মেয়েরা এই সমস্ত গাছের তলায় এসে মাম্বো-জাম্বোর পূজো দেয়।

২১শে ডিসেম্বর মঙ্গো পার্ক বণ্ডো-রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। এই রাজ্যেই তাঁর পূর্ব্বে মেজর হাউটন যখন এসেছিলেন, তখনকার রাজা তাঁর সর্ব্বস্ব লুঠ করে নেয়। সেইজন্যে বণ্ডো-রাজ্যে পৌঁছেই পার্ক উপহার নিয়ে রাজ-সন্দর্শনে চল্লেন। কাফ্রীরা তামাক বড় ভালবাসতো—তারা তামাক পেলে খুব সন্তুষ্ট হতো। পার্ক সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে তামাক এনেছিলেন। কিন্তু রাজামহাশয় তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর লোভ পড়লো মঙ্গো পার্কের ছাতির ওপর। আফ্রিকায় পর্য্যটন করতে হলে ছাতির একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু কি করবেন রাজামহাশয় যখন চেয়েছেন, তখন না দিলেই নয়। ছাতি-পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লোভ পড়লো গিয়ে মঙ্গো পার্কের কোটের ওপর। অবশেষে গা থেকে কোটটাও খুলে দিতে

কাক্রীবাজের সম্মুখে মঙ্গোপার্ক —৭০

হল। রাজামহাশয় অবশ্য তার বিনিময়ে এক তাল সোণা মঙ্গো পার্ককে উপহার দিলেন।

সে রাজ্য ত্যাগ করে যেখান দিয়ে মঙ্গো পার্ককে চলতে হলো, সেখানকার লোকগুলো ভয়ানক হিংস্র। বিদেশী লোক দেখলেই তারা লুঠ তো করবেই, মেরেও ফেলে। একথা মঙ্গো পার্ক আগে থেকেই জানতেন। সেইজন্যে তিনি দিনের বেলায় লুকিয়ে থেকে রাত্রে পথ চলতেন। ভোর হলেই আবার লুকিয়ে থাকতেন। চাঁদের আলোয় সেই নীরব নিস্তব্ধ বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দূরে দেখতে পেতেন যে 'হায়না'র দল সার বেঁধে চলেছে। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। মাথার ওপরে নিঃশব্দে পরিষ্কার আকাশ দিয়ে চাঁদ বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বনের মাঝখানে কোথাও বন্য জন্তুদের চীৎকার সেই চন্দ্রালোক-স্বচ্ছ নীরবতাকে মুহূর্ত্তের জন্য মুখর করে আবার নীরব হয়ে যেতো।

এই রকমে চোরের মত রাত্রে রাতে হেঁটে পার্ক আর একজন কাফ্রী রাজার রাজ্যে এসে ধরা পড়ে গেলেন।

পার্কের কাছে যা ছিল সমস্ত না দিলে সে রাজা কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে দিতে পারেন না জানিয়ে দিলেন। নিরুপায় হয়ে পার্ককে তাই স্বীকার করতে হলো।

রাজার লোক এসে পার্কের বাক্স প্যাঁটরা ঘেঁটে যা খুসী তা নিয়ে নিল—বণ্ডোর রাজার কাছ থেকে যে একতাল সোণা পেয়েছিলেন, তাও কেড়ে নিল। কোনও রকমে

প্রাণে বেঁচে পার্ক সে-রাজ্য থেকে রওয়ানা হয়ে কাস্থ্ন রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন।

সেখানে এসে এক মজার ব্যাপার হলো। এর আগে তারা কেউ আর শাদা লোক দেখে নি। মঙ্গো পার্ককে দেখবার জন্যে দলে দলে লোক আসতে লাগলো। রাজা স্বয়ং অপূর্ব্ব জীব বিবেচনা করে মঙ্গো পার্ককে মহাসমাদরে গ্রহণ করলেন। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হলো যখন এই খবর রাণীমহলে গিয়ে পৌঁছল। রাণীরা দল বেঁধে সব মঙ্গো পার্ককে দেখতে এলো, কিন্তু তারা কিছুতেই বিশ্বাস করে না যে এই শাদা রং আসল। মঙ্গো পার্কের গা ঘসে যখন দেখা গেল যে সত্যই তাঁর গায়ের রঙ ঐ রকম শাদা তখন রাণীরা ঠিক করলেন যে, "নিশ্চয়ই জন্মাবার সময় ওর মা ওকে দুধে চুবিয়ে রেখেছিল।"

সেখানে অবশ্য তারা মঙ্গো পার্ককে খুব সমাদর করে। যে তাঁবুতে মঙ্গো পার্ক থাকতেন সেখানে ঠাকুর দেখার মত রোজ সর্ব্বদাই লোক আসতো; তারা বিস্ময়ে মঙ্গো পার্কের দিকে চেয়ে থাক্তো; কেউ কেউ আবার এগিয়ে এসে গায়ের রঙ পরীক্ষা করে দেখতো। সেখান থেকে অব্যাহতি পেয়ে কিছুদূর অগ্রসর হতেই আর এক মহাবিপদ দেখা দিল। সামনেই ছিল মূরদের রাজ্য। মূররা খৃষ্টানদের ভয়ানক ঘৃণা করতো এবং খৃষ্টানদের ওপর তাদের রাগও ছিল ভয়ানক।

বন্দী নজ্রোপাকি
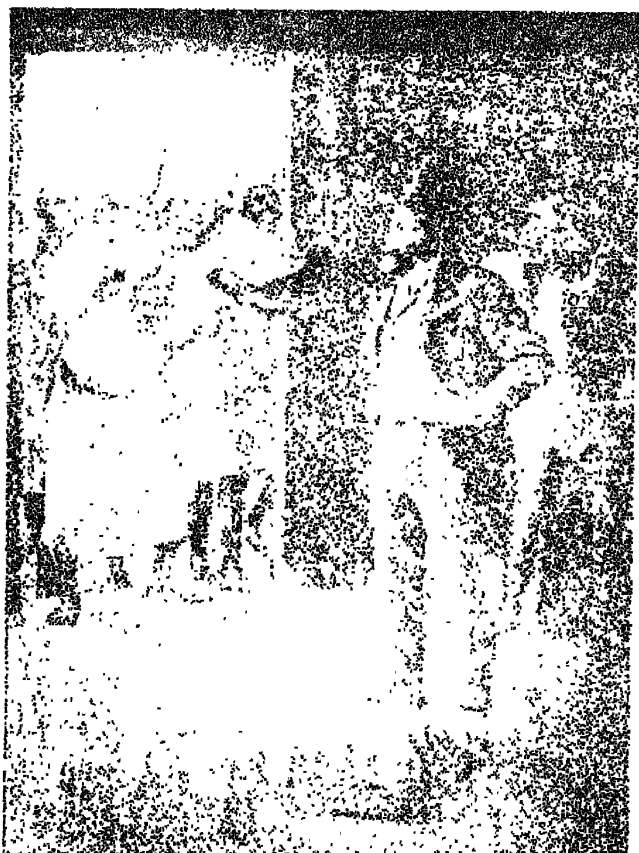
মূরদের রাজ্যের বাইরে একটা গ্রামে পার্ক বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় দেখেন একদল সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। তারা পার্কের হাত বেঁধে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে চল্লো। সেই নিদারুণ রোদের মধ্যে এক ফোঁটাও জল খেতে না দিয়ে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্ককে তাদের রাজার সামনে এনে হাজির কর্লে। সেখানে একটা কুঁড়ে ঘরে পার্ককে বন্দী করে রাখা হলো। পার্কের সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য ডেম্বাকেও বন্দী করে আনা হয়েছিল।

সেই বন্দী অবস্থায় প্রত্যহ পার্ককে নানারকমের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো। ঘরের মধ্যে কোনও জানালা ছিল না—তার ওপর শাহারা মরুভূমির গরম। নিত্য তাঁকে পান করবার জন্যে যে সামান্য জল দেওয়া হতো, তাতে মোটেই তৃষ্ণা দূর হত না। ডেম্বা মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে জল এনে দিতো, কিন্তু ধরা পড়লে ডেম্বার প্রহারের আর অন্ত থাকতো না।

মূরদের দলপতি পার্ককে একজন গুপ্তচর বলে ঠিক করেন। তাঁর ধারণা হলো যে, এই লোকটা খৃষ্টানদের গুপ্তচর সেজে তাদের দেশের সমস্ত খবরাখবর নেবার জন্যে এসেছে। সেইজন্যে যত রকমে তাঁকে কষ্ট দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করা হতে লাগলো। এক এক দিন তৃষ্ণায় তিনি এতদূর ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে, নিজেই কূপের ধারে গিয়ে জল ভিক্ষা করতেন ; কিন্তু সবাই জল তুলে যে যার ঘরে নিয়ে যেতো, বিধর্ম্মী বলে কেউ পার্ককে এক ফোঁটাও জল দিত না।

একদিন পার্ক শুনলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্যে বিচারকদের সভা হয়ে গেছে। কেউ কেউ প্রাণদণ্ডের উপদেশ দিয়েছেন, কেউ কেউ বলেছেন দুটো চোখ উপড়ে নিতে। তারা কেউ বিশ্বাস করে না যে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এ লোকটা এসেছে তাদের দেশের নদীর খবর নিতে—কেন, নদী কি কখনও দেখে নি, না ওদের দেশে নদী নেই।

এই সময় সহসা একদিন রাত্রে মূরদের এক পুরাতন শত্রু তাদের রাজ্য আক্রমণ করে। সমস্ত লোক যখন এই আক্রমণে আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত, সেই সময় পার্ক তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে সরে পড়লেন। সবাই তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, কে আর তখন পার্ককে দেখে! কিন্তু বেশী দূর যেতে না যেতেই দেখেন, তিনজন লোক তাঁদের পিছু পিছু আসছে। কাছে এসে তারা পার্কের গায়ে যে জামাটা ছিল শুধু সেটা খুলে নিয়ে চলে গেল।

জীবনের সমস্ত আশা ত্যাগ করে খালি গায়ে সেই মরুভূ প্রদেশের মধ্যে দিয়ে তবুও পার্ক চলেছেন—কোথায় নাইগার নদীর জল-ধারা! যতদূর এগিয়ে যান, কোথাও এক ফোঁটা জলের দেখা নেই। মাথার ওপর আফ্রিকার মরু-সূর্য্য, পায়ের তলায় উত্তপ্ত বালুকারাশি!

তৃষ্ণায় অধীর হয়ে গাছের পাতা চিবোতে লাগলেন, কিন্তু সে সমস্ত পাতার রস এত তেঁতো যে তা গলাধঃকরণ করা যায়

না। একদিন এই রকম অবস্থায় তৃষ্ণায় প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়ে এসেছে, সহসা মরুভূমির নীল আকাশ কালো মেঘে ভ'রে এলো। দেখতে দেখতে ঝড় উঠলো—আর সেই সঙ্গে এলো প্রবল ধারায় বৃষ্টি। পার্ক ও তাঁর ভৃত্য আকাশের দিকে হাঁ করে বৃষ্টির জল মুখে নিতে লাগলেন। ডেম্বার গায়ের ময়লা জামা খুলে সেটা জলে ভিজিয়ে সেই জল নিঙড়ে দুজনায় আকণ্ঠ পান করলেন।

এমন সময় দূরে ব্যাঙের গলার শব্দ পাওয়া গেল। মঙ্গো পার্ক আকাশের দিকে হাত জোড় করে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন। ব্যাঙের শব্দ যখন শোনা গেছে তখন নিশ্চয়ই কাছে পুকুর আছে এবং লোকের ঘর বাড়ীও আছে। ভোর হতেই দেখেন যে দূরে গাছপালা দেখা যাচ্ছে এবং এগিয়ে গিয়ে দেখেন যে একটা গ্রামও রয়েছে। গ্রামে ঢুকতেই দেখেন যে, এক বুড়ো কাফ্রী-রমণী ঘরের দরজার সামনে বসে চরকা বুনছে। পার্ককে সেই অবস্থায় দেখে বুড়ীর দয়া হলো এবং তার ঘরে যা খাবার ছিল, পার্ককে এনে দিল।

পার্ক বহুবার কাফ্রী-রমণীদের দয়া ও অতিথিপরায়ণতায় বেঁচে যান। একবার বিপদে পড়ে তিনি দুই কাফ্রী-রমণীর আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তারা কোনও রকম দ্বিধা না করে, তাঁকে আশ্রয় দেয়। পার্ক যখন তাদের ঘরে বসে বিশ্রাম করছিলেন, সেই সময় তিনি শুনতে পেলেন যে, কাফ্রী-রমণীরা তাঁত বুনতে বুনতে গাইছে, "বাইরে ঝড় বইছে আর অবিশ্রান্ত

বৃষ্টি পড়ছে। অভাগা শ্বেতকায় লোকটী পথশ্রান্ত হয়ে আমাদের ঘরের সামনে গাছের তলায় এসে বসে পড়লো। হায় তার মা নেই যে তাকে দুধ এনে দেয়, তার স্ত্রী নেই যে তার জন্যে গম পিষে দেয়!"

ইতিমধ্যে পার্ক শুনলেন যে, প্রায় একশো জন ক্রীতদাসকে নিয়ে একটা দল সেগো অভিমুখে যাত্রা ক'রবে। পার্কও সেগোতে পৌঁছতে চান; কারণ তাঁর ধারণায় সেগোতে গেলেই তিনি তাঁর ঈপ্সিত নদীর দর্শন পাবেন। ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরাও তাঁকে সঙ্গে নিতে রাজী হল। কয়েক সপ্তাহ ক্রীতদাসদের সঙ্গেই কেটে গেল। মঙ্গো পার্ক চাক্ষুষভাবে সেই নিষ্ঠুর প্রথার ভয়াবহ বর্ব্বরতা সমস্তই লক্ষ্য করলেন।

সেগো প্রবেশ করবার মুখেই কিছু দূরে মঙ্গো পার্ক সহসা দেখলেন যে, সূর্য্যকরে নাইগার নদীর জল ঝলমল করছে এবং ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিকে বয়ে চলেছে। নাইগারের জলরাশিকে সম্মুখে দেখে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং অনেকের ধারণা ছিল যে পূর্ব্ব থেকে উৎপন্ন হয়ে নদীটী পশ্চিমে কোথাও এসে পড়েছে—সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা তা পার্ক বুঝতে পারলেন।

নাইগার নদীর কূল বেয়ে তিনি প্রথম ঝোঁকে সত্তর মাইল এগিয়ে এলেন এবং প্রত্যেক যায়গার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করলেন। পথে ভয়ানক বর্ষা নেমে এলো। পথ-চলা এক-রকম অসম্ভব হয়ে উঠলো এবং পদে পদে কাফ্রীরা তাঁকে

গুপ্তচর মনে করে বাধা দিতে লাগলো। এই সময় তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং একজন বৃদ্ধ কাফ্রীর দয়া না হলে সে যাত্রা তিনি আর বাঁচতেন কিনা সন্দেহ। এই বৃদ্ধ কাফ্রীটী অত্যন্ত যত্নের সহিত পার্কের সেবা শুশ্রূষা করে এবং পার্ক সেরে উঠলে এই বৃদ্ধ পরামর্শ দেয় যে, আর বেশীদূর অগ্রসর হলেই তাঁকে জীবন দিতে হবে; এমন অবস্থায় দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত।

পার্কের শরীর অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিল এবং তিনি যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন সে উদ্দেশ্য তো আংশিক সফল হয়েছে ভেবে তিনি এবার ফেরবার পথে যাত্রা আরম্ভ করলেন।

মঙ্গো পার্ক পিসানিয়াতে সশরীরে যখন আবার ফিরে এলেন, তখন তাঁকে দেখে তাঁর ডাক্তার-বন্ধু প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে সত্যই পার্ক ফিরে এসেছেন। পিসানিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে পার্ক সোজা ইংলণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

১৭৯৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর আড়াই বছর পরে মঙ্গো পার্ক যখন বিলাতে ফিরে এলেন, তখন মহাসম্মানে সেখানকার লোক তাঁকে অভ্যর্থনা করে। পার্ক বিলাতে এসেই তাঁর যে ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন, তা সারা জগতে দেখতে দেখতে প্রচারিত হয়ে পড়লো। বিবাহাদি করে এবার মঙ্গো পার্ক ঘরসংসারের দিকে নজর দিলেন এবং

সাত বছর ধরে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে তিনি পরমানন্দে জীবন যাপনে করতে লাগলেন।

কিন্তু ১৮০৩ সালে তিনি যখন শুনলেন যে, নাইগার নদীর স্রোতধারার গতি আবিষ্কার করবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট আবার একটা নূতন দল গড়ে তুলছেন, তিনি তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। কোথায় পড়ে রইলো টাকা-কড়ি, যশমান, স্ত্রী-পুত্রের ভালবাসা! ভুলে গেলেন দিনের পর দিন আফ্রিকার মরুভূমিতে এক ফোঁটা জলের অভাবে গাছের পাতা চিবোতে হয়েছে, ভুলে গেলেন যে প্রতিপাদক্ষেপে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল।

মঙ্গো পার্ক এই আবিষ্কার-দলের নেতা হবার বাসনা জানাতে গভর্ণমেণ্টও আনন্দে তাতে রাজী হল। এই দ্বিতীয় অভিযানের উদ্দেশ্য, নাইগার নদীর স্রোত ধরে যতদূর সম্ভব অগ্রসর হওয়া এবং তার দুই তীরের বিভিন্ন জাতিদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা, যাতে পরে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করার সুবিধে হয়।

১৮০৫ সালের ২৭শে এপ্রিল চুয়াল্লিশ জন শ্বেতাঙ্গ সঙ্গী এবং কয়েকজন নিগ্রো নিয়ে মঙ্গো পার্ক দ্বিতীয়বারের মত আফ্রিকার দিকে যাত্রা করেন।

আফ্রিকার উপকূল থেকে নাইগারের তীর পর্য্যন্ত যেতে তাঁকে যে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতে হয়েছিল, তা একটার পর একটা বলা অসম্ভব। এই কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে যে

ফ্যাসিস্টদের আক্রমণ মোকাবিলা —৪৯
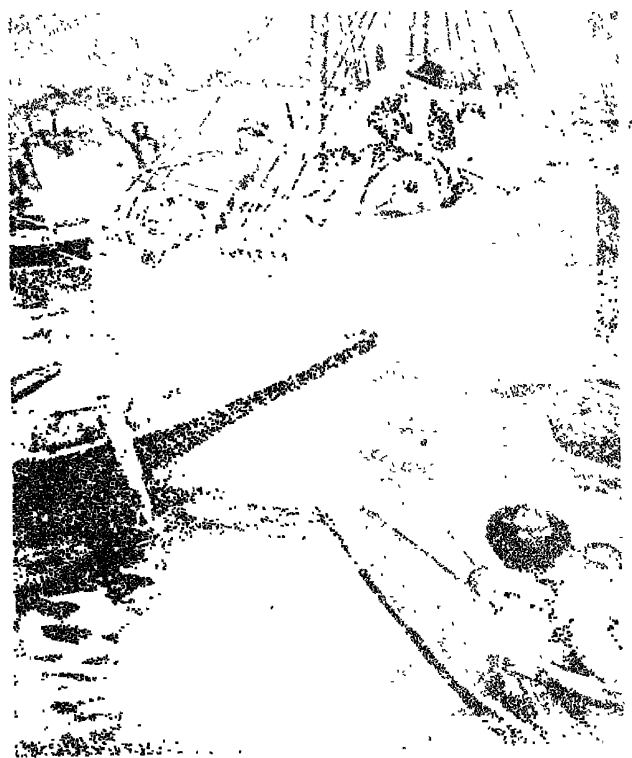
নাইগার নদীর তীরে যখন তিনি এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁর চুয়াল্লিশ জন সঙ্গীর মধ্যে তেত্রিশ জন পরলোক গমন করেছেন। বাকি যে কয়েকজন ছিলেন, তাঁরাও মুমূর্ষু। তবুও তিনি নাইগারের স্রোত ধরে যাত্রা আরম্ভ করলেন। দলের মধ্যে আরও চারজন নদীর উপরেই দেহত্যাগ করলেন—একজনকে অতর্কিত অবস্থায় কুমীরে টেনে নিয়ে গেল। এই সমস্ত মৃত্যুর ও নানারকম গ্লানির বোঝা নিঃশব্দে মাথায় বহন করে পার্ক নাইগার নদীর স্রোত ধরে ১১০০ মাইল অগ্রসর হন। মাঝে মাঝে মাইলের পর মাইল অসুস্থ সঙ্গীদের কাঁধে করেও তাঁকে চলতে হয়েছে, তবুও নির্ভীক পর্য্যটক এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নি।

অবশেষে বুসার নিকটবর্ত্তী এক যায়গায় নদীতে তাঁর নৌকায় তিনি যখন বিশ্রাম করছিলেন, সেই সময় চারদিক থেকে নিগ্রোরা তাঁকে আক্রমণ করে এবং সেই আক্রমণের ফলে আহত হয়ে তিনি তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গীদের সঙ্গে নাইগারের স্রোতমুখে পড়ে যান। তিনি বেরিয়েছিলেন নাইগারের স্রোতধারার গতি নিরূপণ করবার জন্যে। জীবিত-অবস্থায় তিনি তা শেষ করতে পারেন নি—কিন্তু তাঁর মৃতদেহ নাইগারের জলস্রোতের সঙ্গে যেখানে নদী শেষ হয়ে সাগরে মিশেছে, সেখানে গিয়ে মিশে গেল।

[মঙ্গো পার্কের জীবন সম্বন্ধে ইংরাজীতে দুখানি খুব ভাল বই আছে। তাদের নাম হলো—MUNGO PARK by J. Thomson. MUNGO PARK AND THE NIGER by J. Thomson.]

অষ্ট্রেলিয়ার প্রান্তরে

তোমরা হয়ত জানো যে সমগ্র পৃথিবীকে পাঁচটী মহাদেশে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঁচটী মহাদেশের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া অন্যতম। অথচ কিছুদিন আগেও এই মহাদেশের ভিতরে কি আছে, তার খবর কেউ জানতো না।

অনেক লোক এর ভিতরে ঢুকে দেখতে গিয়েছে, কিন্তু কেউই সফল হন নি। কেউ মারা গিয়েছে, কেউ অনাহারে দেহ-ত্যাগ করেছে, কাদেরও বা সেখানকার আদিম-নিবাসীরা মেরে ফেলেছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিক দিয়ে তারা এই দেশের ভেতরে ঢুকে এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তাদের হয় সেইখানেই চির-কালের জন্যে থেকে যেতে হয়েছে, নতুবা ভগ্নদেহে মুমূর্ষু হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

কিন্তু মানুষের জানবার প্রবৃত্তি তাতে একটুও কমে নি। একদিন যেমন করে দক্ষিণ মেরুর নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতায় মানুষ তার জয়পতাকা রেখে এসেছে, যেমন করে আফ্রিকার মরুপ্রান্তরে সে সভ্যতার স্মৃতি বহন করে নিয়ে গিয়েছে, তেমনি জীবন-মরণ তুচ্ছ করে একদিন এই অষ্ট্রেলিয়ার ভয়াবহ প্রান্তরের রহস্যও সে উদ্ঘাটন করেছে।

লিকহার্ট, গ্রেগরী, ষ্টার্ট, ষ্টুয়ার্ট, অক্স্লী, গাইলস্ প্রভৃতি পর্য্যটকদের নাম অষ্ট্রেলিয়ার আবিষ্কারের সঙ্গে চিরকাল লেখা থাকবে। কিন্তু আয়ার ও বার্কের নাম দক্ষিণ-মেরুর আবিষ্কর্ত্তা ক্যাপ্টেন স্কটের মত মানুষ চিরদিন এক অপূর্ব্ব বেদনামিশ্রিত শ্রদ্ধায় স্মরণে রাখবে। আয়ার ও বার্কের করুণ-কাহিনী মানব-সাধনার ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ইংলণ্ডে হাল নগরে ১৮১৫ সালের ৫ই আগষ্ট এডওয়ার্ড জন আয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ধর্ম্মযাজক। ছেলেবেলা থেকেই আয়ার দূর দেশ দেখবার প্রবৃত্তি অর্জ্জন করেন এবং ঘরে চুপটী করে বসে থাকা তাঁর ভাল লাগতো না। একটু বয়স হতে না হতেই একটা জাহাজে চাকরী নিয়ে আয়ার একেবারে অষ্ট্রেলিয়ায় চলে আসেন। তখন অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রের ধারে ধারে কয়েকটী যায়গায় য়ুরোপবাসীরা বসবাস গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সমুদ্রের ধার ছাড়া দেশের ভেতরে তারা তখনও প্রবেশ করতে পারে নি।

অষ্ট্রেলিয়ায় এসে আয়ার আপনার খেয়ালে একাকী ভিতরের দিকে চলে যেতেন। এবং এই রকম করেই তিনি দুটী হ্রদ আবিষ্কার করেন। এই বিরাট দেশের ভিতরে কি আছে তা আবিষ্কার করবার জন্যে তাঁর মনে প্রবল বাসনা জাগে এবং যতই শোনেন যে বারে বারে লোকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে, ততই তাঁর মনে এই কার্য্যে অগ্রসর হবার জন্যে এক নিদারুণ দুঃসাহসিকতা জাগে। যা কেউ পারে নি, সেই

দুঃসাধ্য সাধনায় জয়ী হতে প্রত্যেক বীরপুরুষের মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা নেশার মত তাঁদের মনকে ঘিরে থাকে।

সেই সময় আয়ার শুনলেন যে, দক্ষিণ হতে উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে যাবার জন্যে একটা অভিযানের আয়োজন চলেছে। আয়ার আর কাল বিলম্ব না করে সেই অভিযানের নেতৃত্ব নেবার জন্য আবেদন করলেন এবং হলও তাই। পঁচিশ বছর বয়সে আয়ার ১৮৪০ সালের জুন মাসে একদিন আডেলেডী হতে উত্তরাভিমুখে বেরিয়ে পড়লেন।

আডেলেডী পরিত্যাগ করে আয়ার যতই অগ্রসর হতে লাগলেন, ততই ক্রমশঃ গাছপালা ঘরবাড়ীর বদলে পাথর-ভরা মাঠ আর জনশূন্য মরুভূমির চিহ্ন দেখা যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে দু একজন আদিম-নিবাসীর চেহারা দেখা গেল বটে, কিন্তু তারা সাদা-রঙের লোক দেখে দূর থেকে পালিয়ে যেতো। ওধারে জল-তেষ্টায় তাঁরা ভয়ানক কষ্ট পেতে লাগলেন। কোথাও এক ফোঁটা জলের দেখা নেই—শুধু পাথর আর মাঠ, মাঠ আর পাথর, আর মাথার ওপরে সূর্য্যের প্রখর কিরণ।

সেখানকার লোকদের কাছে যে জল কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করবেন, তার উপায়ও নেই, কারণ তারা তাঁকে দেখলেই দূর থেকে পালিয়ে যেতো। এরকম অবস্থায় শেষ তাঁরা যেখানে জল দেখে এসেছেন, আবার সেখানে ফিরে যেতেন। ফিরে না গিয়ে, করবেন আর কি?

এমনি করে চলতে চলতে একদিন রাত্রে দেখেন যে তাঁরা একটা ঘন বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। ঘোড়াগুলো তৃষ্ণায় আর দাঁড়াতে পারছে না, অথচ সেই রাত্রেই সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তাঁরা ঘোড়া চালালেন—গাছের ডালে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সকাল বেলা সেই বন পেরিয়ে এলেন।

এইভাবে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় দেখে আয়ার আডেলেডীতে ফিরে এলেন। ফিরে এসে কিন্তু আবার যাত্রা করবার জন্য আয়োজন করলেন। এবার যাত্রা করার সময় তিনি বললেন, "এখনও আমাদের সামনে ৮৫০ মাইল জায়গা অনাবিষ্কৃত হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু অনাবিষ্কৃত কিছুই থাকতে পারে না।"

সঙ্গে রইলো তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য উইলী এবং বন্ধু বাক্‌স্টার আর দুজন আদিম-নিবাসী। উইলীও সেখানকারই আদিম-নিবাসী, কিন্তু সে আয়ারকে ভয়ানক ভালবাসতো এবং তাঁর সঙ্গ কিছুতেই ছাড়্‌তো না।

কিছুদূর যেতে না যেতেই সেবারকার মত জলকষ্ট এবারেও দেখা দিল। তবে এবার ব্যাপার আরও নিদারুণ হলো। সারাদিন চলে যায় অথচ কোথাও একফোঁটা জলের দেখা নেই। সবার চেয়ে অসুবিধা হলো, ঘোড়াগুলোকে নিয়ে; তারা তৃষ্ণায় আর চলতে পারে না। অথচ এই জনমানবহীন প্রান্তরে তাদের চেয়ে বন্ধু আর কে আছে? একবার ১৫০ মাইল একাদিক্রমে অতিক্রম করে এসে তাঁরা অবশেষে এক-

জায়গায় একটা ডোবা দেখতে পেলেন। কাদার সঙ্গে মিশে সেখানে খানিকটা জল আছে। তৃষ্ণায় যখন প্রাণ যায়, তখন কাদা আর জল দেখবার সময় কোথায়? কিন্তু জল খেতে গিয়েই তাঁদের মনে পড়লো, ঘোড়াগুলোর তো আগে জল-খাওয়া প্রয়োজন। সেই ভেবে তাঁরা ঘোড়াগুলোকে আগে জল খেতে দিলেন। বিচারহীন জন্তুরা ডোবার জল নিঃশেষে পান করে নিলো।

সেই অবস্থায় শুধু আকাশের দিকে চেয়ে তাঁরা আবার রওয়ানা হলেন। কিন্তু তৃষ্ণায় তখন প্রাণ কণ্ঠাগত। উইলী আর থাকতে না পেরে একটা গাছের শেকড় তুলে তাই চুষতে লাগলো। তার দেখাদেখি সবাই তাই করলো। ভোর হতে না হতেই প্রথম যে-শিশির পড়ে, মাটির ওপর থেকে তাই তুলে তুলে খেয়ে কোনও রকমে জিভের অসহ্য টান মেটাতে হলো।

কিন্তু আর কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই আর এক মহাবিপদ দেখা দিল। উইলী ছাড়া সঙ্গে আর যে দুজন সেখানকার লোক ছিল, তাদের মনে ক্রমশঃ নানারকমের সন্দেহ হতে লাগলো। তারা মনে করলো যে, এই দুটো শাদা লোক নিশ্চয়ই তাদের নরক বা এইরকম একটা কোনও যায়গায় নিয়ে চলেছে—তা না হলে এত কষ্ট হবে কেন? আর কেনই বা তারা এত কষ্ট সহ্য করবে?

একদিন রাত্রে তাঁবু ফেলে যখন আয়ার ও বাক্‌সৃটার ঘুমুচ্ছিলেন, তখন সেই দুটো লোক এসে আয়ারের রিভালভার

নিয়ে অন্ধকারে গুলি ছুড়তে থাকে। গুলির আঘাতে বাক্‌স্‌টার সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। সারারাত্রি অন্ধকারে বিশ্বস্ত ভৃত্য উইলী ও বন্ধুর মৃতদেহকে সামনে রেখে কোনও রকমে রাত্রি প্রভাত হলো। কিন্তু প্রভাতের আলোয় আয়ার দেখেন যে, রসদ যা কিছু সংগ্রহ করা ছিল, সমস্তই তারা নিয়ে পালিয়েছে। সেই নির্জ্জন প্রান্তরে বন্ধুকে সমাধিস্থ করে আয়ার একমাত্র উইলীকে সঙ্গে নিয়ে তবুও চললেন। জল নেই, খাদ্য নেই, পথেরও কোন দিশা নেই। খাদ্যের অভাবে বাক্‌স্‌টারের ঘোড়াটীকে হত্যা করে তারই মাংস খেতে আরম্ভ করলেন। মাঝে মাঝে কেঙ্গারু গুলী করে তারই মাংস পুড়িয়ে খেতে হলো। কিন্তু তবুও তিনি অগ্রসর হয়ে চলেছেন। অবশেষে একদিন মরুভূমি পার হ'য়ে ঈপ্সিত আলব্যানী প্রদেশে এসে উপস্থিত হলেন। অজানা দূরের পথ জানা হয়ে গেল। তাঁর এই অপূর্ব্ব কষ্ট-স্বীকার ও সাধনার জন্য পরে তিনি নিউজিল্যাণ্ডের গভর্ণর হন।

কিন্তু মধ্য-অষ্ট্রেলিয়া তখনও অনাবিষ্কৃত ছিল। সবার ধারণা ছিল যে, সে প্রদেশটা সমস্তই মরুভূমি ; তাই সেদিকে কেউ অগ্রসর হয় নি। কিন্তু আয়ারের ফিরে আসবার খবর পেয়ে বার্ক বলে একজন আইরিশ যুবক মধ্য অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের জন্য একটা দল গড়ে তুললেন। বার্ক অষ্ট্রেলিয়ায় সৈনিক হয়ে এসেছিলেন এবং সামান্য সৈনিক থেকে তিনি ক্রমশঃ একজন সেনাপতি হন।

২০শে আগষ্ট ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বার্ক তাঁর দলবল নিয়ে মেলবোর্ণ সহর থেকে রওয়ানা হলেন। দশ বারো দিন যাত্রা করার পর তাঁরা মেনিন্দিতে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেইখানেই তাঁবু ফেললেন। মেনিন্দিতে বার্ক, উইল্‌স্‌, কিং এবং আর পাঁচজন ঠিক করলেন যে, তাঁরা প্রথম দল কুপার ক্রিকের দিকে এগিয়ে যাবেন। সেখানে গিয়ে যদি দেখেন যে, পথে পশুদের খাদ্য ও জল বেশ ভালই আছে, তাহলে তাঁদের আসবার জন্যে খবর দেবেন।

সেই রকম ব্যবস্থা করে একদল মেনিন্দিতে থেকে গেল আর একদল কুপার ক্রিকের দিকে অগ্রসর হলো। কুপার ক্রিকে পৌঁছে বার্ক দেখলেন যে, সেখানে ঘাস, গাছপালা তো প্রচুরই আছে, জলও রীতিমত পাওয়া যায়। তখন তিনি সেখানে তাঁবু ফেলে মেনিন্দির দলের কাছে খবর [illegible] যে, তারা যেন শীগ্‌গির চলে আসে। বার্ক তাঁর সহযাত্রীদের নিয়ে কুপার ক্রিকেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু দিন যায়, যে লোক খবর দিতে গিয়েছিল, সে আর ফেরে না।

বহুদিন বৃথা অপেক্ষা করার পর ১৬ই ডিসেম্বর বার্ক, উইল্‌স্‌, কিং ও আর একজন কুপার ক্রিক থেকে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে তিন মাসের মত খাদ্য সামগ্রী এবং ছ'টী উট ও একটী ঘোড়া নিলেন। ফেরবার সময়ের জন্য কিছু খাদ্য তাঁবুতেই রেখে গেলেন।

কুপার ক্রিকের অবশিষ্ট বন্ধুদের কাছে বিদায় নেবার

আমিয়েল — ৫৭

বার্ক — ৫৬
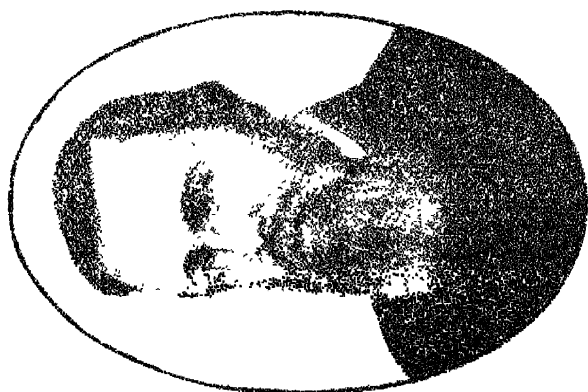
সময় বার্ক জানিয়ে গেলেন যে, "যদি তিন মাসের মধ্যে ফিরে না আসি, তাহলে জানবে যে আমি মরে গিয়েছি।"

সোজা উত্তরমুখে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা চারমাস পরে এক-দিন সত্যিসত্যিই একেবারে উত্তর প্রান্তের শেষে সমুদ্রের ধারে এসে পড়লেন। আয়ার পূব থেকে পশ্চিম যাবার পথ বার করেছিলেন; বার্ক আর তাঁর বন্ধু, দক্ষিণ থেকে উত্তর যাবার পথ আবিষ্কার করলেন।

কিন্তু ফেরবার সময় হলো বিপদ্। জন্তুগুলো ক্লান্ত হয়ে অধিকাংশই পথে মরে গেল। যাবার পথে তাঁবুতে তাঁবুতে যে সমস্ত খাবার রেখে গিয়েছিলেন, সে সমস্ত বন্যপশুতে খেয়ে ফেলেছে, কোথাও খাদ্য মেলে না। এক তাঁবু থেকে খাবারের আশায় আর এক তাঁবুতে আসেন, আর পৌঁছে দেখেন, কোনই আহার নেই। বার্ক, উইল্‌স্ ও কিং ছাড়া আর একজন যিনি ছিলেন, আহারের অভাবে পথের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করলেন।

কোনও রকমে ক্বচিৎ বন্যপশুর মাংসে দেহ-রক্ষা করে অস্থিসার হয়ে যখন তাঁরা তিনজনে আবার কুপার ক্রিকের তাঁবুতে এলেন, তখন তাঁদের মনে আশা হলো যে, সে-যাত্রা তাঁরা বুঝি বেঁচে গেলেন। কিন্তু তাঁবুতে এসে দেখেন যে, তাঁবু জনশূন্য, জিনিষপত্তর কোথাও কিছুই নেই। একটা জায়গায় দেখেন একটা খুঁটী পোতা রয়েছে এবং তার ওপরে কাগজে লেখা আছে "Dig" অর্থাৎ "খোঁড়ো"। বার্ক ইঙ্গিতের

অর্থ বুঝে সেই জায়গা খুঁড়ে দেখেন যে, তার তলায় কয়েক দিনের মত খাবার রয়েছে। সেইখানেই আর এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেল, তাতে লেখা আছে যে, বার্কদের জন্যে চার মাস অপেক্ষা করে মাত্র আগের দিন তাঁরা তাঁবু পরিত্যাগ করে গিয়েছেন। আর একদিন আগে পৌঁছলেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত।

একবার তিনজনে ভাবলেন যে সামনের দলকে এগিয়ে গিয়ে ধরতে, কিন্তু তিনজনেরই শরীরের অবস্থা তখন এ রকম শোচনীয় যে, এক মাইল পথও আর তাঁরা অতিক্রম করে যেতে পারেন না। শরীর মাত্র কয়েকখানি হাড় চামড়া দিয়ে ঢাকা ছিল।

সেই তাঁবুতে পাঁচদিন বিশ্রাম করে, তাঁরা আবার ফেরবার পথে রওয়ানা হলেন। খাবার যা কিছু ছিল তাও ফুরিয়ে আসবার উপক্রম হলো। সোজা দক্ষিণমুখো না গিয়ে তাঁরা কুপার ক্রিকের ধার দিয়ে পশ্চিমমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁদের ধারণা হলো যে, নদীর ধার দিয়ে গেলে অন্তত জলের ভাবনাটা ভাবতে হবে না। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই দেখা গেল যে, নদীটা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে একটা ভীষণ জঙ্গলভরা জলাভূমির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা! নদীর ধার বেয়ে পশ্চিম-মুখোও যাওয়া হলো না। দেহের যন্ত্রণায় ও ক্ষুধার তাড়নায় যেন তাঁরা একরকম উন্মাদ হয়ে উঠলেন। সেখান থেকে আবার তাঁরা

অষ্ট্রেলিয়ার প্রান্তরে কিং ও বার্ক।

বার্কের মৃতদেহের সম্মুখে কিং —৫৯

পূর্ব্ব মুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, কোথাও আহার অথবা জনপ্রাণীর কোনও সাড়া শব্দ নেই। নিরুপায় হয়ে তাঁরা গাছের ফল পাতা খেতে লাগলেন।

কুপার ক্রিকের তাঁবুতে তাঁরা আবার যখন ফিরে এলেন, তখন উইল্‌সের উত্থান-শক্তি আর নেই। বার্ক আর কিং মৃত্যুর সঙ্গে শেষ সংগ্রামে প্রস্তুত হয়ে ঠিক করলেন যে, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে উইল্‌স্‌কে এই তাঁবুতে থাকতে হবে। যদি কোথাও খাদ্য সামগ্রী তাঁরা দুজনে সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলেই ফিরবেন, নতুবা সেই নির্জ্জন অরণ্যে একই ভাগ্য তিনজনকে স্বীকার করে নিতে হবে।

উইল্‌স্‌কে তাঁবুতে রেখে বার্ক আর কিং খাবারের অন্বেষণে বেরুলেন। একদিন কোনও রকমে হাঁটার পর এক বনের মাঝখানে এসে বার্ক পড়ে গেলেন, আর সেখান থেকে উঠলেন না। অষ্ট্রেলিয়ার জনহীন প্রান্তরে বার্কের মৃতদেহ পড়ে রইলো। কিং সেই ভয়াবহ অবস্থায় তবুও চলতে লাগলেন। দুদিনের পর কিং আদিম-নিবাসীদের এক আড্ডায় পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে সেই ভগ্ন অবসন্ন দেহে আবার কুপার ক্রিকের তাঁবুর দিকে রওয়ানা হলেন। উইল্‌স্‌ আহারের আশায় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে! তাঁবুতে এসে দেখেন, উইল্‌স্‌ নেই, উইল্‌সের মৃতদেহ শুধু পড়ে আছে!

একে দেহ ভগ্ন, তার ওপর এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনায়

কিং একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অবসন্ন দেহে তিনি সেই বন্ধুদের স্মৃতি-ভরা অরণ্যেই শুয়ে পড়লেন।

ওধারে এঁদের প্রত্যাবর্ত্তনের দেরী দেখে দলে দলে লোক অনুসন্ধানে বেরিয়েছিল। তাদের এক দল অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত অবস্থায় কিংকে দেখতে পায় এবং ভাগ্যক্রমে সেই যাত্রায় একমাত্র কিং উদ্ধার পান। বার্ক, উইল্‌স্ আর গ্রের মৃতদেহ অষ্ট্রেলিয়ার অরণ্যের ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে রইলো। আর এই মহৎ আত্মদানের ফলেই আজ অষ্ট্রেলিয়া বৃটীশ-সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

[এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বইগুলি পড়তে পারো—THE ROMANCE OF AUSTRALIAN EXPLORING by H. de R. Walker. THE DISCOVERY OF AUSTRALIA by G. Collingridge.]

নূতন পৃথিবীর সন্ধানে

স্পেন দেশের এক মঠে দুপুর বেলায় একজন লোক শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। সঙ্গে তাঁর সাত বছরের একটী ছেলে। না খেতে পেয়ে মুখখানা তার শুকিয়ে গিয়েছে।

মঠের দরজা ঠেলতে একজন পাদ্রী বেরিয়ে এলেন। কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায় লোকটী জানালেন, তিনি এক বন্ধুর খোঁজে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু বন্ধুকে সেখানে না পেয়ে, পিতা-পুত্রে আশ্রয়হীন হয়ে এই মঠের দরজায় এসে বসে পড়েছেন। দু'দিন ধরে তাঁদের কোনও খাওয়া দাওয়া হয়নি।

পাদ্রী মঠের মধ্যে পিতা পুত্রকে নিয়ে গিয়ে আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন। খাবার সময় পরিচয় হলো যে লোকটীর নাম কলম্বাস্। ইতালীর জেনোয়া শহরে তাঁর বাড়ী। ক্রমশঃ আলাপ আরও একটু গভীর হলে পাদ্রী জানতে পারলেন যে, কলম্বাস্ একটা নতুন দেশ আবিষ্কার করতে চান। তাঁর বিশ্বাস যে, সমুদ্রপথে সোজাসুজি পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছবার একটা পথ আছে, তিনি সেই পথ ধরে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করবেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউই বিশ্বাস করে না, পাগল বলে তাঁর কথা সবাই উড়িয়ে দেয়। সমুদ্র-পথে যাত্রা করবার যে খরচ কেউই তা তাঁকে দিতে চায় না।

অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে তিনি দেখা করেছেন, কিন্তু কেউই তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হয়নি।

পাদ্রী কলম্বাসের কথা শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হলেন এবং তাঁর ছেলেটীর ভার নিতে রাজী হলেন। ছেলেকে সেই মঠে রেখে দিয়ে কলম্বাস্ বেরুলেন য়ুরোপের সেই সময়-কার সমস্ত রাজা মহারাজাদের কাছে। সবাইকে তাঁর বাসনার কথা জানালেন, কিন্তু সবাই উপহাস করে তাঁকে ফিরিয়ে দিল। ইংলণ্ডের রাজার কাছে গেলেন, পর্ত্তুগালের রাজার কাছে গেলেন, কিন্তু কেউই কলম্বাসের কথায় বিশ্বাস করে তাঁকে সাহায্য করলেন না। এমনি করে সাতটা বছর কেটে গেল। নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করবার জন্যে সেদিন কেউই কলম্বাস্‌কে সাহায্য করে নি।

সাত বচ্ছর পর তিনি আবার স্পেনের রাণী ইসাবেলার কাছে আবেদন করলেন। তখন স্পেন বিজয়-গর্ব্বে উল্লসিত। সমুদ্র-পথে স্পেন তার অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই ইসাবেলা কলম্বাসের কথা শুনে তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। রাণী ইসাবেলার সাহায্যে কলম্বাস্ লোকজন নিয়ে অজানা সমুদ্রের পথে নূতন জগতের সন্ধানে বেরুলেন। তিনি ভারতবর্ষের সন্ধান পাননি বটে, কিন্তু তিনি আর এক নূতন জগৎ আবিষ্কার করেন। ভারতবর্ষের অনুসন্ধানে কলম্বাস্ সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে ইতালীর জেনোয়া বন্দরে এক গরীবের

ঘরে কলম্বাস্ জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা বাপ মা কষ্ট স্বীকার করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখান। যে-সব জিনিষে কোনও ছেলের মন যায় না, কলম্বাস্ সেই সমস্ত বিষয়ই পড়তেন। ভূগোল, জ্যামিতি, অঙ্ক এই সমস্তই কলম্বাসের খুব ভাল লাগতো। ছেলেরা ছবি ভালবাসে, কিন্তু কলম্বাসের ভাল লাগতো,—মানচিত্র। ছেলেবেলা থেকেই তিনি নিজে খুব ভাল মানচিত্র আঁকতেও পারতেন।

একুশ বছর বয়সে জেনোয়া শহর থেকে কলম্বাস্ পর্ত্তুগাল দেশের রাজধানী লিসবন শহরে আসেন। সেই সময় লিসবন শহর ছিল ভূগোল অধ্যয়নের একটা মস্ত বড় কেন্দ্র। কলম্বাস্ লিসবনে এসে ভূগোলচর্চ্চায় মন দিলেন এবং এই সময়ই তাঁর মনে ধারণা জন্মায় যে, সোজাসুজি পশ্চিম দিক দিয়ে যেতে পারলে সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষে পৌঁছন যায়। সবাই তখন ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনেছিল—তারা শুনেছিল যে সেখানকার গাছে সোনার ফল হয়, নদীতে মুক্তা থাকে। তাই ভারতবর্ষে আসবার জন্যে সেই সময়কার অনেক বড় বড় নাবিক অনবরত চেষ্টা করছিলেন—কেউই কিন্তু ঠিক পথ খুঁজে বার করতে পারছিলেন না। সীমাহীন সমুদ্রের দুর্গম তরঙ্গের মধ্যে ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের পরিচয়ের পথ লুকিয়েছিল।

সেই সময় যত মানচিত্র ও ভূগোলের বই পাওয়া যেতো, সে-সমস্ত অনুসন্ধান করে কলম্বাস্ স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন যে, নিশ্চয়ই সমুদ্র-পথে পশ্চিম থেকে যাত্রা করলে

ভারতবর্ষের দেখা মিলতে পারে। কিন্তু যখনই কোনও লোককে কলম্বাস্ তাঁর সিদ্ধান্তের কথা বলতেন, তখনই লোকে তাঁকে উপহাস করতো। সামান্য একটা "ছোকরা"র কথা লোকে বিশ্বাস করবে কেন ?

কলম্বাস্ একটী মেয়েকে ভালবাসতেন। দু'জনার মধ্যে খুব গভীর ভালবাসা হয় এবং কলম্বাস্ সেই মেয়েটীকে বিবাহ করেন। কলম্বাসের শ্বশুর ছিলেন একজন বিখ্যাত নাবিক। তিনিও অনেক দিন ধরে ভারতবর্ষে আসার পথ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেছেন, এবং সমুদ্র-পথের অনেক মানচিত্র এঁকেছিলেন। কলম্বাস্ দেখলেন যে, তাঁদের দু'জনেরই সিদ্ধান্ত এক। তখন তাঁর মনে একমাত্র বাসনা হলো, সত্যি সমুদ্র-পথে যাত্রা করে এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ করতেই হবে। দুঃখের বিষয় এই সময় তাঁর পত্নী-বিয়োগ ঘটে। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কলম্বাস্ জগতে একরকম অসহায় হয়ে পড়লেন। যেখানেই যান, কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে না, সাহায্য করার কথা তো দূরে থাক্।

যত বাধা পেতে লাগলেন, কলম্বাসের মনের বাসনা ততই প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। অজানা সমুদ্রের তরঙ্গ নিত্য যেন হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকে, বাতাসে তিনি সমুদ্রের আহ্বান-ধ্বনি শুন্‌তে পান। য়ুরোপের সমস্ত ধনী ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে গেলেন, সবাই তাঁকে উন্মাদ বলে ফিরিয়ে দিল। অবশেষে কলম্বাস্ ইংলণ্ডের রাজার কাছে উপস্থিত হলেন

সপ্তম হেন্‌রী কলম্বাসের কথা শুনে তাঁকে বাতুল বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করলেন। পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জনও তাই করলেন ; অবশেষে হতাশ হয়ে কলম্বাস্ যে মঠে ছেলেকে রেখে গিয়েছিলেন, সেই মঠে এসে আবার আশ্রয় নিলেন।

সেই মঠের যিনি প্রধান যাজক, তিনি ছিলেন রাণী ইসাবেলার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। কলম্বাস্ তাঁর কাছে প্রাণের সমস্ত দুঃখ নিবেদন করলেন। কলম্বাসের কথা শুনে প্রধান যাজকের মনে কলম্বাস্‌কে সাহায্য করবার জন্য সত্যিকারের বাসনা হলো এবং তিনি স্বয়ং কলম্বাস্‌কে রাণী ইসাবেলার কাছে নিয়ে গেলেন। রাণী ইসাবেলা কলম্বাস্‌কে সাহায্য করতে রাজী হলেন।

এতদিনের এত অপমান ও প্রত্যাখ্যান সহ্য করে অবশেষে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট কলম্বাস্ অজানা সমুদ্রের পথে রওয়ানা হলেন। তাঁর জন্য রাণী ইসাবেলা তিনখানা জাহাজ তৈরী করে দিলেন, কিন্তু কোন লোকই কলম্বাসের সঙ্গে যেতে চাইলো না। সে হলো আর এক বিপদ! সবারই ধারণা যে কলম্বাসের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—তার সঙ্গে এই রকম অনির্দ্দেশ্য পথে যাওয়া মানেই সাগরের বুকে প্রাণ দেওয়া। সেই সময় একশো জন দাগী বদ্‌মায়েসের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা হয়। সেই সব আসামীদের বলা হলো যে, তারা যদি কলম্বাসের সঙ্গে যায়, তাহলে তাদের মৃত্যু-দণ্ড রহিত হতে পারে। তারা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর চেয়ে নিরুপায় হয়ে

কলম্বাসের সঙ্গেই যেতে রাজী হলো। কলম্বাস্ তখন আপনার চিন্তায় উন্মাদ—তিনি সেই সমস্ত মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত দাগী আসামীদের নিয়েই অজানা পথে যাত্রা করলেন।

জগতে কোনও দিন আর কেউ এরকম অবস্থায় [illegible] বেরোয় নি। যেদিন কলম্বাস্ স্পেনের তীর ত্যাগ করে যাত্রা করেন, সেদিন অসংখ্য লোক এই দৃশ্য দেখবার জন্যে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু সবাইএর চোখে ছিল জল—কারণ তারা ভেবেছিল যে, কলম্বাস্ এই যে যাচ্ছে আর কখনও ফিরবে না। জাহাজে যে একশো জন সঙ্গী ছিল, তাদেরও মুখে কোনও হাসির চিহ্ন নেই, কোনও উৎসাহের রেখা নেই। কারণ তারা জানতো যে, এ তাদের মৃত্যু-দণ্ডের বদলে চির-নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা। ফাঁসীর কাঠে ঝুলে মরতে হতো, এ না হয় সমুদ্রের ঢেউয়ে মরতে হবে। এই নিরুদ্যমতা ও বিষণ্ণতার মধ্যে এক-মাত্র কলম্বাসের মনে বিষাদের সামান্যতম রেখা ছিল না। আপনার অন্তরে সত্যকে উপলব্ধি করলে, যে মহা-আনন্দ সর্ব্ব-দেহমনকে ছেয়ে রাখে, সেই আনন্দে কলম্বাসের মন তখন সকল ভয়, ভাবনা, বিষাদের অতীত। কার চোখে জল, কার বুকে আশঙ্কা, কার মন নিরুৎসাহ তা দেখবার তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না।

অনুকূল বাতাসের সাহায্যে ক্যানারী দ্বীপে কলম্বাস্ ভালোয় ভালোয় পৌঁছলেন। সেখানে একমাস থেকে জাহাজ মেরামত করে অজানা সমুদ্রের মধ্যে আবার কলম্বাস্ পাড়ি দিলেন।

দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, কোথাও

স্থলের চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু জল, আর জল। তাঁর সঙ্গীরা অন্ধকারে দল বেঁধে কি সব ফিস্‌ফাস্ করে। তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো—কলম্বাস্‌কে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে তারা দেশে ফিরে যাবে। কলম্বাস্ ব্যাপার বুঝতে পারলেন। এগিয়ে গিয়ে সঙ্গীদের বোঝাতে লাগলেন—আর কিছুদিন অপেক্ষা কর—নিশ্চয়ই স্থল দেখা যাবে। মরু-পথে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যেমন পিপাসায় অন্ধ হয়ে চোখের সামনে অনবরত মরীচিকা দেখে—তেমনি অনবরত সমুদ্রে থেকে তারা প্রায়ই স্থল দেখতে পেতো। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই তারা আপনাদের মনের ভুল বুঝতে পারতো, আর সঙ্গে সঙ্গে আরও নিরুৎসাহ হয়ে পড়তো।

এই রকম করে সত্তর দিন সমুদ্রে থাকার পর একদিন ভোর বেলা কলম্বাস্ সহসা জাহাজের ওপর থেকে দূরে স্থল দেখতে পেলেন। আনন্দে তাঁর বুক কেঁপে উঠলো। এমন সময় দেখেন মাথার ওপর দিয়ে পাখীর ঝাঁক উড়ে চলেছে। তবে তো এবার আর মনের ছলনা নয়—নিশ্চয়ই সামনে স্থল আছে। সঙ্গীদের মুখে এবার হাসি দেখা দিল এবং তারাও উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

তারপর বিপুল জয়োল্লাসে তারা জাহাজ থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কলম্বাস্ মাটিতে নেমেই নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করলেন। সেই আমেরিকার মাটিতে প্রথম য়ুরোপীয় পদার্পণ করলো।

সেখান থেকে কলম্বাস্ ভারতবর্ষ যাবার পথের দিকে অগ্রসর হলেন। পথে ভারত-দ্বীপপুঞ্জে এসে একে একে বহুদ্বীপে তিনি স্পেনের পতাকা উড়িয়ে দিলেন এবং দ্বীপে দ্বীপে বসবাস করবার জন্যে পঞ্চদশ জন সঙ্গীকে রেখে দিলেন। কিন্তু তাঁর গণনায় ভুল হওয়ার দরুণ তিনি ভারতবর্ষে আর পৌঁছতে পারলেন না।

সে-যাত্রার মত কলম্বাস্ স্পেনে ফিরে এলেন। কলম্বাসের মুখে সমুদ্রের ওপারে নূতন জগতের সংবাদ পেয়ে স্পেনের লোকেরা মহা-উল্লাসে কলম্বাস্কে অভিনন্দন করলো। রাজ-পথ দিয়ে তাঁকে লোকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেল।

কলম্বাস্ আবার বেরুলেন, ভারতবর্ষের সন্ধানে। এবারেও তিনি ভারতবর্ষের নাগাল পেলেন না। কিন্তু আরো বহু দ্বীপ স্পেনের নামে অধিকার করলেন এবং সেই সমস্ত যায়গায় এক একজন করে সঙ্গীকে শাসনকর্ত্তারূপে রেখে এলেন। কিন্তু যাদের তিনি এই সমস্ত দ্বীপে রেখে এলেন, তারা লোভে ও মোহে সেখানকার আদিম-নিবাসীদের ওপর অত্যাচার সুরু করে দিল। তারাই আবার গোপনে কলম্বাসের নামে নানা-রকমের মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে রাণী ইসাবেলার কাছে নালিশ করতে লাগলো। একদিন যে কলম্বাস্ স্পেনের হয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে রাজ্যের পর রাজ্য আবিষ্কার করেছিলেন, মন্দ লোকের প্ররোচনায় রাণী ইসাবেলা সেই কলম্বাস্কে ঘৃণা করতে লাগলেন। স্পেনের লোকেরাও কলম্বাস্কে সন্দেহ

করতে লাগলো। অবশেষে একদিন কলম্বাস্ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কারারুদ্ধ হলেন। নানাপ্রকারের মিথ্যা অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন এবং রাণী ইসাবেলা সমস্তই বিশ্বাস করেন।

এমনি করেই অনেক সময় জগৎ তার মহাপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে! সক্রেটিসকে বিষপান কর্‌তে হয়েছে, গ্যালিলিওকে চির-নির্ব্বাসন দণ্ড পেতে হয়েছে। যে কলম্বাস্‌কে একদিন স্পেনের লোক রাজপথ দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল—শৃঙ্খলিত অবস্থায় সেই কলম্বাসের গায়ে তারা সেদিন থুতু দিয়েছিল। কলম্বাস্ যখন মারা যান, তখন তাঁর তত্ত্বাবধান করবার জন্যও কেউ ছিল না;—অথচ জীবন-মরণ তুচ্ছ করে, তিনিই আধখানা পৃথিবীর খবর অপর অর্দ্ধেকের কাছে পৌঁছে দেন।

আমেরিকা আর য়ুরোপে আজ যে মিতালী, তার প্রথম ঘটক হচ্ছেন ক্রিষ্টফার কলম্বাস্ এবং এই ঘটকালীর জন্য তিনি পুরস্কার পান—বৃদ্ধ-বয়সে কারাবাস!

Sir C. R. Markham কলম্বাসের একটী সুন্দর জীবনী লিখেছেন। বইখানির নাম হলো LIFE OF COLUMBUS.]

ক্যাপ্টেন কুক্

১৭৫৯ সাল। উত্তর-আমেরিকার আধিপত্য নিয়ে তখন ফরাসী ও ইংরাজে আমেরিকায় ভয়ানক যুদ্ধ চলেছে! দুজনেই সেখানে নতুন গিয়ে পড়েছে—দুইজনেরই নতুন রাজ্য অধিকার করবার বাসনা প্রবল।

যুদ্ধ যখন তুমুলভাবে চলেছে, সেই সময় একদিন রাত্রে সেণ্ট লরেন্স নদীর ওপর দিয়ে একখানা ছোট বোট নিঃশব্দে চলেছে। বোটের ভিতরে গুটিকয়েক লোক নীরবে বসে আছে। কারুর মুখে কোনও সাড়া শব্দ নেই। তারা যে কাজে বেরিয়েছে, তাতে যে-কোনও মুহূর্ত্তে তাদের মৃত্যু হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই নদীর তীরেই সামনে ফরাসী সৈন্যরা রয়েছে। নদীর চারদিককার অবস্থা না জানার দরুণ ইংরাজেরা এগিয়ে গিয়ে ফরাসীদের আক্রমণ করতে পারছিল না। তাই তারা ঠিক করলো যে, এই নদীর গতি এবং আশে-পাশের যায়গার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা আগে উচিত, কিন্তু সামনেই ফরাসী সৈন্যরা নদীর সমস্ত মোহনা অধিকার করে রয়েছে—জানতে পারলেই তখনই, যে যাবে, তাকে তো মেরে ফেলবেই। এখন এ দুঃসাহসিক কাজের ভার কে নেবে?

সেই সময় ইংরাজদের সৈন্যদলে জেম্‌স্ কুক্ বলে একজন সৈনিক ছিলেন। নৌবিদ্যা এবং দুঃসাহসিকতায় দলের মধ্যে

তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বল্লেন যে, এ কার্য্যের ভার তিনিই নেবেন। কয়েকজন অনুরক্ত সঙ্গী নিয়ে রাত্রে কুক্ সেণ্ট লরেন্স নদীর স্রোত ধরে আশে-পাশের জায়গার জরিপ করতে বেরুলেন। সারারাত্রি ধরে নিঃশব্দে অন্ধকারে আপনার কাজ সেরে কুক্ যখন ফিরছিলেন, তখন দেখেন যে তিনি ধরা পড়ে গেছেন। তাঁকে ধরবার জন্যে দু' তিনখানি নৌকা জোরে তাঁর দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। কুক্ যত তাড়াতাড়ি পারলেন বোট চালাতে লাগলেন। অনেক দূর এগিয়ে আসবার পর, শত্রু-পক্ষের বোট যখন তাঁকে ধরে ধরে, এমন সময় পিছন দিক থেকে চার পাঁচখানি বৃটিশ নৌকা এসে পড়তে সে যাত্রা কুক্ বেঁচে গেলেন। সেই রাত্রের অন্ধকারে নদীর গতি এবং তীর পর্য্যবেক্ষণ করে কুক্ যে মানচিত্র তৈরী করেছিলেন, পরে দেখা গেল যে, সেটা একেবারে নিখুঁত।

ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক আবিষ্কর্ত্তা জেম্‌স্ কুক্ ১৭২৮ সালে ২৭শে অক্টোবর ইংলণ্ডের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি লেখাপড়া শেখবার কোনও সুবিধা পান নি। একটা দোকানে কাজ করতেন। সেখানে আবার ঘটলো এক বিভ্রাট। একদিন দোকানদার এসে দেখেন যে, বাক্স থেকে কিছু পয়সা পাওয়া যাচ্ছে না। কুকের ওপর তাঁর সন্দেহ হতে তিনি কুক্‌কে দোকান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু পরে জানলেন যে সে পয়সা কুক্ নেন নি।

এই ব্যাপারে কুকের মনে ভয়ানক দুঃখ হলো। একটা জাহাজে কয়লা-তোলার চাকরী নিয়ে কুক্ সেই বালক-কালেই মাটি ছেড়ে জলে পাড়ি দিলেন। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন কুক্‌কে বিশেষ ভালবাসেন এবং তাঁরই সাহায্যে কুক্ ক্রমশঃ নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন এবং ক্রমশঃ সৈন্য-বিভাগে যোগদান করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

সেই সময় ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান রয়েল সোসাইটী শুক্র-গ্রহের গতিবিধির বিষয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিল। ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে যেখানে তাহিটী দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপ থেকে এই গ্রহের গতিবিধি লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কোথায় তাহিটী দ্বীপ আছে, তার সঠিক খবর কেউ জানতো না।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ক্যাপ্টেন কুক্ সঙ্গে ১৮ মাসের মত খোরাক নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পথরেখাহীন তরঙ্গের মধ্যে তাহিটী দ্বীপের অনুসন্ধানে বেরুলেন। পথে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে লুকানো বহুদ্বীপ আবিষ্কার করে অবশেষে তিনি তাঁহার লক্ষ্য তাহিটী দ্বীপে এসে পৌঁছলেন। সেখানে কয়েকমাস প্রয়োজন মত অবস্থান করে, কুক্ প্রশান্ত মহাসাগর পরিভ্রমণ করে, একটা ম্যাপ তৈরী করেন। মানচিত্রের ইতিহাসে এই ম্যাপটা অতি প্রসিদ্ধ। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত দ্বীপের খবর কুক্ তাঁর সঙ্গে

ইংলণ্ডে নিয়ে এলেন। ক্যাপ্টেন কুকের তৈরী সে ম্যাপ সযত্নে বৃটীশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের পর্য্যবেক্ষণ শেষ করে কুক্ যখন ফিরছিলেন, সেই সময় দূরে তিনি একটা বৃহৎ দেশ দেখতে পেলেন। এই দেশই বর্ত্তমান অষ্ট্রেলিয়া। কুকের পূর্ব্বে যারা অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছিল, তারা উত্তর দিকের জনমানবহীন তীর দেখে অষ্ট্রেলিয়াকে বসবাসের অনুপযুক্ত সামান্য দ্বীপ বিবেচনায় গ্রাহ্য করে নি। কিন্তু কুক্ পূর্ব্ব-দিক দিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় এসে পৌঁছন এবং সেখানকার প্রকৃতির শ্যামরূপ দেখে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভবিষ্যতে এই দেশ একটী মহাদেশরূপে ইংলণ্ডের অধীন হবে। ক্যাপ্টেন কুক্ যখন এই সমস্ত নতুন তথ্য সংগ্রহ করে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন, তখন তাঁর নাম সকলের মুখে।

সেই সময় লোকের একটা ধারণা ছিল যে, অষ্ট্রেলিয়ার আরও দক্ষিণে আর এক মহাদেশ আছে। ক্যাপ্টেন কুক্ এই ধারণার সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্যে আবার দূর সমুদ্রের পথে রওয়ানা হলেন। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখলেন যে, সম্মুখেই বরফের বিরাট প্রাচীর, মহাদেশের কোনও চিহ্ন নেই। ফেরবার পথে তিনি বিশেষ শ্রম স্বীকার করে প্রশান্ত মহাসাগরের আর একটী বিরাট মানচিত্র তৈরী করেন এবং এবারেও বহু দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

পঞ্চাশ বছর বয়সে কুক্ স্থির হয়ে ইংলণ্ডে বসবাস আরম্ভ

করলেন। জাতির জন্য তিনি কিশোর কাল থেকে আসন্ন বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অনবরত যে অসাধ্য-সাধন করেছিলেন, তার জন্যে ইংলণ্ড তাঁকে নানাভাবে পুরস্কৃত করে।

সেই সময় প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটল্যাণ্টিক মহাসাগরে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে আসা সম্ভব কিনা, সেই নিয়ে গবেষণা চলছিলো। কিন্তু এমন কোনও লোক পাওয়া যাচ্ছিল না, যিনি সত্যই সমুদ্র-পথে যাত্রা করে এর একটা সিদ্ধান্ত করেন। ইংলণ্ডের লোকেরা এই দুঃসাধ্য কাজের জন্যে বৃদ্ধ বয়সে কুক্‌কে আর উত্যক্ত করতে লজ্জা বোধ করছিল। তাই স্থির হলো যে, কুক্‌ই ঠিক করে দেবেন, এ কাজের ভার কার ওপর দেওয়া যেতে পারে।

দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ডে একটীও লোক পাওয়া গেল না, যিনি এই দুঃসাধ্য কাজের ভার নেন। অবশেষে কুক্‌ নিজেই বল্লেন, "আচ্ছা, তা হলে, আমিই যাব।"

সেই বৃদ্ধ-বয়সে ঘরের সমস্ত মায়া-মমতা ত্যাগ করে সেই বিপদ্‌-সঙ্কুল অজানা সমুদ্রের পথে কুক্‌ আবার যাত্রা করলেন। নানাদিক পর্য্যটন করে অবশেষে তিনি দেখলেন যে, উত্তর-পশ্চিম দিয়ে যাতায়াতের পথ অনন্ত-তুষার রুদ্ধ। নিরাশ হয়ে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের স্যাণ্ডুইচ দ্বীপে নঙ্গর ফেললেন। তখন নিদারুণ শীতকাল। সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। কুক্‌ ঠিক করলেন যে, তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তিনি শীতকালটা এই দ্বীপেই কাটাবেন। এখানে বসবাস করবার সময়

সেখানকার আদিম-নিবাসীদের সঙ্গে কুকের দলের ক্রমশঃ ঝগড়া বাঁধতে লাগলো। আদিম-নিবাসীরা যখন দেখলো যে, শাদা লোকগুলো তাদের দেশে বাড়ী বেঁধে থাকতে চায়, তখন তারা বিষম চটে গেল। ব্যাপার ক্রমশঃ গুরুতর হয়ে আসছে দেখে কুক্ স্বয়ং গিয়ে তাদের রাজার সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর এক ভৃত্যের মধ্যস্থতায় রাজার সাহায্য প্রার্থনা করে জানালেন যে, তাঁরা এ দ্বীপে থাকতে চান না ; শীতকাল কেটে গেলেই তাঁরা এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবেন।

কুক্ যখন রাজার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেই সময় দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হলো। আদিম-নিবাসীরা সকলেই সজাগ হয়ে উঠলো। একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল যে, শাদা লোকেরা গুলী করে তাদের একজন লোককে মেরে ফেলেছে।

কুক্ দেখলেন, ভীষণ দৈব বিড়ম্বনা। আদিম-নিবাসীরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে আক্রমণ করলো। নিরুপায় হয়ে তিনি গুলী ছুড়লেন, কিন্তু একা পারবেন কেন? তারা লোহার দাণ্ডার আঘাতে ক্যাপ্টেন কুক্‌কে সেইখানেই মেরে ফেললো।

সেই নির্জ্জন দ্বীপে নিঃসহায় হয়ে এইরকম একান্ত নিষ্ঠুর-ভাবে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক আবিষ্কর্ত্তা নিহত হন। সমুদ্রকে তিনি ভালবাসতেন, তাই তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রের কোলেই শেষ আশ্রয় পায়।

[ক্যাপ্টেন কুকের বিস্তারিত জীবনের জন্য W. Beasant প্রণীত Captain Cook গ্রন্থ পড়তে পার]

পরিশিষ্ট

প্রাচীন জগতের প্রথম দেশ-আবিষ্কারের যে লিখিত কাহিনী আমরা পাই, তার তারিখ হলো যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় পাঁচশো বছর আগেকার।

এই সময়ে তোমরা জানো যে আফ্রিকার উত্তরে কার্থেজ বলে এক মহানগরী ছিল। ফিনিসিয়ান্ বণিকরা এই নগর পত্তন করেন। ফিনিসিয়ানরা সেই সময়ে সব চেয়ে বড় ব্যবসাদার জাতি ছিল। তারা সমুদ্র-পথে বাণিজ্য করে বেড়াতো এবং খুব ভাল নাবিক ছিল।

এই কার্থেজ শহরে হান্নো বলে একজন বিখ্যাত নাবিক ছিলেন। তিনি প্রায় ষাটখানি নৌকা নিয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দেশ আবিষ্কার করতে বাহির হন। হান্নো পশ্চিম আফ্রিকার বহু দেশ সেই সময় আবিষ্কার করেন এবং আমরা এখন যে-নগরকে বলি Sierra Leone, প্রথম তা হান্নো আবিষ্কার করেন। এই সমস্ত জায়গায় নেমে তিনি এক রকম অদ্ভুত জানোয়ার দেখতে পান—গায়ে লম্বা লম্বা চুল, মানুষের মত মুখ এবং মানুষের মত তারা দুপায়ে দাঁড়াতেও পারে। হান্নো এই সব জন্তুর নাম দেন Gorullai. সেই থেকে এই জানোয়ারদের আমরা গরিলা বলেই জানি।

তারপর গ্রীকদের মধ্যে এবং এশিয়ায় চীনদের মধ্যে অনেক বড় বড় পরিব্রাজক জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁদের ঠিক দেশ-আবিষ্কারক বলা চলে না। হান্নোর পর দেশ-আবিষ্কারক হিসাবে নাম করতে হয়—দিগ্বিজয়ী বীর সেকন্দর শাহ্‌র।

এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, পারস্য, আফগানিস্থান পার হয়ে আলেকজান্দার বিয়াস নদীর তীর পর্য্যন্ত আসেন। শুধু যে দিগ্বিজয়ের বাসনা তাঁকে এতদূর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছিল, তা নয়—নতুন দেশ দেখবার, নতুন দেশ আবিষ্কার করবার, তাঁর একটা প্রবল বাসনা ছিল। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তাঁর রণক্লান্ত সৈন্যরা সকলেই বলে উঠলো—তারা আর এই রকমভাবে অজানা পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে ঘুরে মরতে পারবে না—তারা বাড়ী ফিরে যেতে চায়। কিন্তু আলেকজান্দারের মনে তখন আবিষ্কারকের নেশা জেগে উঠেছে। সমুদ্র-পথে ব্যাবিলোনিয়া থেকে ভারতবর্ষে আসবার পথ আবিষ্কার করবার জন্যে তিনি তাঁর সেনাপতি Nearchusকে পাঠালেন। Nearchus বহু বিপদের মধ্য দিয়ে সেই পথ আবিষ্কার করে ফিরে এলেন। Nearchusএর এই কীর্ত্তির প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে সমুদ্র-পথ আবিষ্কার করে তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আলেকজান্দার এক বিরাট ভোজ দেন। এই ভোজেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আটত্রিশ বছর বয়সে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ স্থলপথের সন্ধান জগৎকে দিয়ে সেকেন্দর শাহ্‌ পরলোক গমন করেন।

এই বইএ তোমরা পড়েছ যে, কলম্বাস্ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। কিন্তু কলম্বাসের আবিষ্কারের পাঁচশো বছর আগে একজন নরওয়েবাসী প্রথম আমেরিকার অস্তিত্বের কথা সাক্ষাৎ-ভাবে জানে। সেই হলো য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রথম সাক্ষাৎ।

আইসল্যাণ্ডে Herjulf বলে একজন দুঃসাহসী নরওয়ে-দেশবাসী নাবিক ছিল। তোমরা হয়ত জানো না যে, আইসল্যাণ্ড নরওয়ে-দেশবাসী নাবিকরাই আবিষ্কার করে। বৃদ্ধ বয়সে হারজুল্ফ্ একমাত্র পুত্র বিয়ার্নিকে ঘরে রেখে নৌকা নিয়ে আবিষ্কারে বাহির হন এবং বলে যান যে অমুক দিনের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই ফিরবেন।

বিয়ার্নি পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসতো। সে যখন দেখলো যে নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তার পিতা ফিরলেন না, তখন সে নৌকা নিয়ে নিজেই বেরুলো বৃদ্ধ পিতাকে সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে খুঁজে বার করবার জন্যে। বহু-দিন অজানা সমুদ্রের মধ্যে অতিবাহিত করার পর বিয়ার্নি একটা নতুন দেশ দেখতে পেলো। তার উপকূল ধরে সে দিনের পর দিন চলতে লাগলো। অবশেষে সে একটা দেশে এসে পৌঁছল—সেখানে দেখে যে, সব বড় বড় তুষারের পাহাড়। আমেরিকার উপকূল দিয়ে বিয়ার্নি গ্রীনল্যাণ্ডে উপস্থিত হয় এবং দৈবযোগে এই গ্রীনল্যাণ্ডে বিয়ার্নি তার বৃদ্ধ পিতাকে খুঁজে পায়।

আইসল্যাণ্ডে ফিরে এসে বিয়ার্‌নি সেই নতুন জগতের কথা সেখানকার শাসনকর্ত্তা Erick the Redএর কাছে জানালো। এরিকের এক পুত্র ছিল, তার নাম (Leif) লিফ্‌। যখন শুনলো যে বিয়ার্‌নি শুধু সেই নতুন দেশের ধার দিয়ে চলে এসেছে, নামে নি, তখন তার প্রবল বাসনা হলো যে, সে সেই নতুন দেশে যাবে। পিতাকে তার অন্তরের বাসনা জানাতে, পিতা পুত্রকে বিদায় দিতে সম্মত হলেন না। তখন লিফ্‌ গোপনে তার দলবল নিয়ে সেই অজানা দেশ আবিষ্কারের জন্য বেরুলেন। আজকাল যে সব যায়গাকে আমরা Labrador, New foundland, New England বলি, লিফ্‌ সেই সব যায়গায় উপস্থিত হন এবং তিন বৎসর সেখানে বসবাস করার পর সেখানকার আদিম অধিবাসীদের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

বিখ্যাত আবিষ্কারক কলম্বাস্‌ যখন তাঁর ঐতিহাসিক সমুদ্র-ভ্রমণে বাহির হন, তার পূর্ব্বে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আইসল্যাণ্ডে আসেন। অনেকে অনুমান করেন যে, এইখানে এসে বিয়ার্‌নি এবং লিফের কাহিনী শুনে সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের তাঁর প্রেরণা জাগে।

বৃটেনের বিখ্যাত রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো। তিনি নিজে কোনও আবিষ্কার করেন নি বটে, কিন্তু দেশ-আবিষ্কার সম্বন্ধে সেই সময়কার বৃটেন-বাসী নাবিকদের তিনি প্রভূত প্রেরণা দেন। Sighelm এবং Wulf-

ston বলে দুজন নাবিককে তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্মে পাঠান।

তারপর দুটী ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে—যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেশভ্রমণ এবং দেশ-আবিষ্কারের প্রবৃত্তি বিভিন্ন দেশে দেখা দেয়। একটা হলো মধ্য-এশিয়া থেকে হুণদের আক্রমণ আর একটা হলো ক্রুসেড বা খৃষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে প্যালেষ্টিনে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ।

এই হুণদের আক্রমণের ফলে রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। বারে বারে এই দুর্দ্ধর্ষ হুণদের আক্রমণে য়ুরোপ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কোথায় তারা থাকে, কি তাদের রীতি-নীতি, কেন তারা এমন নিষ্ঠুর, কি করেই বা তাদের শক্তিক্ষয় করা যায়, এই হলো তখন য়ুরোপের রাজাদের প্রধান চিন্তা। এদের ভাল করে জানবার জন্মে তাই পোপ চতুর্থ ইনোসেণ্ট Corpini নামে একজন ধর্ম্ম-যাজককে মধ্য এশিয়ায় হুণদের রাজ্যের তথ্য সংগ্রহ করবার জন্মে পাঠান। এই ধর্ম্ম-যাজকের কাহিনী থেকে য়ুরোপ অজানা মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে বহু তথ্য পায়।

তারপর থেকে মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে জানবার য়ুরোপের প্রচুর আগ্রহ হয়। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে নিকোলো, মাপ্তিয়ো এবং মার্কো পোলো নামে তিনজন ইতালিয়ান্ মধ্য-এশিয়া আবিষ্কারের জন্য বাহির হন। ওঁরা তিনজনে যথাক্রমে হচ্ছেন, পিতা, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পুত্র। মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনী জগতে অদ্বিতীয়। মার্কো পোলো যখন ইতালী ত্যাগ করেন, তখন

তিনি বালক এবং পুনরায় ইতালীতে যখন প্রবেশ করেন, তখন তিনি প্রৌঢ়। যখন তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন, তখন কেউই তাঁকে ইতালীয়ান্ বলে আর বিশ্বাস করে না। এবং তাঁর চরম দুর্ভাগ্য যে তিনি কারারুদ্ধ হন। এই কারাবাসে থেকেই তিনি তাঁর অপরূপ ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন।

মার্কো পোলো মধ্য-এশিয়ার বহু স্থানের পরিচয় য়ুরোপকে দেন। পামির, কাশগর্, ইয়ারকান্দ, খুটান, লুপ-নর, ইয়ারকান্ প্রভৃতি যায়গা সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জগৎ কিছুই জানতো না। এই মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে এই সমস্ত দেশের বিবরণ রেখে গিয়েছিলেন। তারপর বিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত পর্য্যটক এবং পণ্ডিত Sven Hedin এই বিরাট অজানা দেশের রহস্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এই অজানা দেশের বহু স্থানে বিদেশীদের প্রবেশ করতে দিতো না—বিদেশী বলে জানতে পারলেই তখনই মৃত্যুদণ্ড হতো।

মার্কো পোলোর পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবদেশে একজন বিখ্যাত পর্য্যটক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম এব্নে বাতুতা। তিনি সিরিয়া, আরব, পারস্য, মোম্বাসা, ভারতে কালিকাট, সিংহল, চীন এবং মধ্য-আফ্রিকার বহুদেশ পর্য্যটন করেন। তাঁর লেখা হতে য়ুরোপ এই সব দেশ সম্বন্ধে অনেক অন্তরঙ্গ ব্যাপার জানতে পারে।

তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগালের যুবরাজ হেনরী আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে

আছেন। আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁর এত প্রসিদ্ধি হয় যে, ইতি-হাসে তাঁর নাম Henry the Navigator রূপে উল্লিখিত হয়। রাজসভার সমস্ত বিলাসিতা থেকে দূরে তিনি আপনার জন্য একটা বিরাট প্রাসাদ তৈরী করেন। সেখানে দেশের সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, দুঃসাহসী নাবিকদের তিনি সমবেত করেন এবং এক একটী দল করে দূর পথে তিনি অজানা দেশ-আবিষ্কারের জন্য অভিযান পাঠান।

তাঁর প্রেরণায় Zarco, Goncalvey Codamosto—Madiera, Azores, Cape Verde Islands, Senegal আবিষ্কার করেন। হেনরীর বাসনা ছিল আফ্রিকার অন্তঃস্থল আবিষ্কার করা; কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি তাঁর আরব্ধ কার্য্যের ফল দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে Diegocam নামে একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক প্রথম Congo আবিষ্কার করেন এবং বিখ্যাত নাবিক Bartholomew Diaz কেপ্ অফ ষ্টর্মস্ ঘুরে আসেন। এই Cape of storms এর নাম পরে পর্ত্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন Cape of Good Hopesএ পরিণত করেন।

এই সময় বিখ্যাত আবিষ্কারক Christopher Columbus তাঁর ভাই Bartholomew Columbusকে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরীর কাছে আমেরিকা-আবিষ্কারের প্রস্তাব জানিয়ে পাঠান। কিন্তু পথে Bartholomew অত্যন্ত বিপদে পড়েন এবং সর্ব্বস্ব জল-দস্যুরা লুণ্ঠন করে নেয়। ইংলণ্ডে

যখন তিনি উপস্থিত হলেন তখন তাঁর ভিখারীর বেশ। সেই বেশে ইংলণ্ডের রাজার সম্মুখে তিনি যখন উপস্থিত হলেন, তখন কেউই তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো না। আমেরিকা আবিষ্কারের গৌরব ইংলণ্ড প্রত্যাখান করলো।

কিন্তু এই ঘটনার কিছুকাল পরেই সপ্তম হেনরী ক্যাবট এবং তাঁর পুত্র সেবাষ্টিয়ানকে সমুদ্র-পথে দেশ-আবিষ্কারের জন্য পাঠালেন। ক্যাবট Nova Scotia, Newfoundland এবং Florida আবিষ্কার করেন।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস্ কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার পর, পর্তুগীজ নাবিকদের মধ্যে ভারতবর্ষে পৌঁছবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের জন্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। তোমরা হয় তো জানো যে, কলম্বাস্ বেরিয়েছিলেন সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্যে, কিন্তু তিনি মাঝপথে সন্ধান পেলেন—আমেরিকার। এই ঘটনার কয়েক বছর পরে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-ডাগামা আফ্রিকা পরিক্রমণ করে পরের বৎসর ভারতবর্ষে কালিকাটে এসে উপস্থিত হন। এই পথ দিয়ে প্রথম যে ইংরাজ ভারতবর্ষে আসেন, তাঁর নাম Thomas Stevens. Stevens ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন।

এই সময় তিনজন নাবিক সমুদ্র-পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম Sebastian, তারপরে ইংরাজ নাবিক Drake এবং ক্যাভেণ্ডিস যথাক্রমে ১৫৭৭ এবং ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র-পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

য়ুরোপ থেকে এশিয়ার সমুদ্র-পথে আসবার দুটী পথের নাম সাধারণতঃ তখন দেওয়া হতো North-West-Passage এবং North-East-Passage. এই দুটী পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে য়ুরোপীয় নাবিকরা উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার আশে-পাশের বহু সাগর উপসাগর আবিষ্কার করেন এবং আজও পর্য্যন্ত উক্ত দুই মহাদেশে সাগর উপসাগরের নাম যে-যে নাবিক আবিষ্কার করেন, তাঁর তাঁর নামের সঙ্গে সংযুক্ত। যেমন Hudson Bay, Strait of Magellan, Forbisher Bay, Davis Strait, Jorres Strait, Baffin Bay, Bering Strait ইত্যাদি।

অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার সম্বন্ধে তোমরা এই বইতে বার্ক, কিং এবং ক্যাপ্টেন কুকের কাহিনী পড়েছ। তাঁর পূর্ব্বে William Dampier বলে একজন ইংরেজ নাবিক প্রথম এই দ্বীপে নামেন। কিন্তু দেশ-আবিষ্কারের চেয়ে ব্যক্তিগত লুণ্ঠন ও অত্যাচার করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে আবেল টাসমান বলে একজন ডাচ অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে যে দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তাঁর নামে সেই দ্বীপ টাসমানিয়া নামে আজ পরিচিত।

যদিও কলম্বাস্ আমেরিকা আবিষ্কার করেন, কিন্তু সেখানে পাশ্চাত্য জাতিদের গিয়ে বসবাস করতে অনেক সময় লাগে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে একদল ধর্ম্ম-যাজক ইংলণ্ড ত্যাগ করে আমেরিকায় বসবাস স্থাপন করবেন বলে

যাত্রা করেন। ইতিহাসে এই ধর্ম্মযাজকদের নাম Pilgrim fathers. Mayflower নামক জাহাজে তাঁরা আমেরিকার Cape Cod নামক যায়গায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই ঘটনার কয়েক বছর পূর্ব্বে ফ্রান্স দেশ থেকে Samuel de Champlain নামে একজন সেনাপতি উত্তর আমেরিকায় এসে কুইবেক শহরে বসবাস করেন। এই ভাবে ক্রমে আমেরিকায় ফরাসী ও ইংরাজ ঔপনিবেশিকে বহুদিনব্যাপী সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

দক্ষিণ-মেরুর আবিষ্কার সম্বন্ধে কাপ্তেন স্কটের করুণ-কাহিনী তোমরা এই বইতে পাবে। কিন্তু স্কট ও আমুন-সেনের পূর্ব্বে দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবার জন্য বহু লোক চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে স্যার সাকেলটনের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। স্কট এবং আমুনসেনের পূর্ব্বে তিনিই দক্ষিণ-মেরুর নিকটতম রেখা পর্য্যন্ত পৌঁছান এবং তিনি পথের যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে আনেন, তা' স্কট এবং আমুনসেনের যথেষ্ট কাজে লাগে।

দুই মেরুই মানুষকে সমান ভাবে আকর্ষণ করে। উত্তর-মেরু আবিষ্কারের জন্যও বহুলোক বহুদিন ধরে চেষ্টা করেন। তার মধ্যে বিখ্যাত নরওয়ে দেশবাসী ডাঃ নান্‌সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম গ্রীনল্যাণ্ড সোজাসুজি ভাবে পার হন এবং উত্তর-মেরুর নিকট থেকে ফিরে আসেন। তারপর Salomon Andree বলে একজন সুইডেনবাসী

বেলুনে উত্তর-মেরু পৌঁছবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাবাসী Robert Edwin Peary সর্ব্বপ্রথম উত্তর-মেরুতে উপস্থিত হন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারক আমুনসেন এরোপ্লেনে উত্তর-মেরু পরিভ্রমণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এ চেষ্টা সফল হয় নি। পরে আমেরিকার বিখ্যাত ক্যাপ্টেন বিয়র্ড এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। এরোপ্লেনের সাহায্যে তিনি প্রায় ৭ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করেন এবং সেই অঞ্চলের নাম দেন—Little America। ক্যাপ্টেন বিয়র্ডের মত যে একদিন মেরু-প্রদেশ থেকে খনিজ সম্পত্তি হিসেবে বিপুল ঐশ্বর্য্য পেতে পারে।

মধ্য-এশিয়া এবং তিব্বত আবিষ্কারের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। বর্ত্তমান যুগের অধিবাসী Dr. Sven Hedin এবং ভারতবর্ষ থেকে Sir Francis Younghusband এই দুই দেশ সম্বন্ধে সমস্ত খবর জগৎকে জানাতে পেরেছেন।

এই তিব্বত আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা কথা উল্লেখ করে এই প্রবন্ধ শেষ করবো।

তিব্বতের ধর্ম্মযাজকদের বলে লামা। এই লামারা তিব্বতে সর্ব্বেসর্ব্বা। তারা কোনও বিদেশীকে তাদের দেশে ঢুকতে দিত না। সেইজন্য তিব্বতে প্রবেশ করতে হলেই ছদ্মবেশে প্রবেশ করতে হতো। তোমরা শুনে হয়ত সুখী হবে যে, এই ভারতবর্ষ থেকে কয়েকজন বাঙ্গালী ছদ্মবেশে তিব্বতে গিয়ে সেখানকার তথ্য সংগ্রহ করে আনেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে,

তাঁদের নাম অজ্ঞাত রাখা হয়েছে। একজনকে বলা হয়েছে প্রথম পণ্ডিত, আর একজনকে বলা হয়েছে দ্বিতীয় পণ্ডিত। আর একজন লোকের নাম পাওয়া যায়—তাঁর নাম হলো নয়ন সিং। নয়ন সিং তিব্বতের প্রায় একহাজার মাইল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রথম পণ্ডিত ব্রহ্মপুত্রের উৎস-মুখের আবিষ্কার করেন এবং দ্বিতীয় পণ্ডিত যে সমস্ত নগর আবিষ্কার করেন তা তখন পর্য্যন্ত ইউরোপীয়দেরও অজ্ঞাত ছিল। তিনি তিব্বতে স্বর্ণ-খনিরও আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁদের দুজনের নাম এখনও আবিষ্কার করা হয় নি। সরকারী দফ্‌তরের সীমাহীন প্রান্তরে কোথায় তা লুকিয়ে আছে!

—উপহারের বই—

		১৲	”	নিউ দিল্লী হোটেল	॥০
	বিনামালয়	৷৷০	৮৩।১,	বিশ্বনাথ বস্ত্রালয়	৷৷০
”	মলয় গ্রীল	॥০	”	গাঙ্গুলী এণ্ড কোং	২৲
”	সুরথকুমার দাস	॥০	”	পলি ফটো ষ্টুডিও	॥০

, জয়গঙ্গা টি ১৲

, দরবেশ ষ্টোর্স ।০

ন্যাশনাল ভ্যারাইটি ষ্টোর্স ২৲

, মতিলাল শ্রীবাস্তব ।০

১৩৮।১, শয্যাশ্রী ॥০

১৩৯, স্বরাজ দাশগুপ্ত ২৲

১৪০, ইষ্টার্ণ উল এণ্ড ষ্টেশনারী ষ্টোর্স ১৲

গিরিধারীলাল সাউ (হাতিবাগান বাজার) ১৲

গণেশচন্দ্র পাল (") ॥০

৭বি, মন্মথনাথ ঘোষ ১৲ | ৭৯।২বি. কে, এল, চ্যাটার্জি ১৲

৫

„ হিন্দ ব্যাঙ্ক লিঃ

„ কালীগঙ্গা ক্লথ ষ্টে

৯৫, ফ্রেণ্ডস্ কেবিন

৯৬এ, ডাঃ কে, গাঙ্গুলী